বাংলাদেশের প্রবন্ধ

বাঙালির আত্মপরিচয়ের সূত্রপাত

---আবু জাফর শামসুদ্দীন

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'বাংলাদেশে ইসলামে সুফি মত বেশি প্রসার লাভ করে। সুফি মতের ইসলামের সহিত বাংলার মূল সুরটির তেমন বিরোধ নাই। সুফি মতের ইসলাম সহজেই বাংলার প্রচলিত যোগমার্গ এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।' আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের মতে 'আধ্যাত্মিক ও মারফতি সাহিত্যে ইরানের সুফি প্রভাবও রয়েছে এবং বাউল মুর্শিদা সাহিত্য ছাড়াও নিছক দার্শনিক তত্ত্ব এখানে কম মেলে না। বিভিন্ন ধারার সমন্বয়ের কারণ বোধ হয় এই যে, মানুষের হৃদয়ানুভূতিতেও মননের এমন একটি স্তর আছে যেখানে সব ভেদাভেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশের সাধকগণ অতি মাত্রায় আচারবর্জিত ও মর্মনিষ্ঠ। তাই এমন নির্বিচার সমন্বয় সম্ভব হয়েছে।' সাহিত্য বিশারদের মন্তব্যের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বলতে পারি যে, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, আদিবাসী নির্বিশেষে পল্লী বাংলার কৃষিজীবী মানুষের পক্ষে যথাসম্ভব সমন্বিত সামাজিক জীবন যাপন করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। এক মাঠে হালচাষ, একই ধরনের ফসল উৎপাদন, মূলত একই ধরনের আহার্য গ্রহণ, এক হাটে হাটবাজার, এক ঘাটে স্নান প্রভৃতি করার ফলে দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে সমন্বয় সাধিত হতে বাধ্য। সুফি দরবেশ সাধক সন্ন্যাসী বাউল বৈরাগী প্রভৃতি ধর্মসংস্কারকগণ এই পরিবেশগত বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতামালার এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ-উদ্ধৃত মধ্যযুগের ভারতীয় কবি রজ্জবের দুটি পংক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। রজ্জব বলছেন, 'সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলে সো ঝুঁট। জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিবিন ভাবই রুধ।' 'সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে, রজ্জব বলছে, এই কথাই খাঁটি, এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই করো।' (রবীন্দ্রনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ)।

সংকর জাতের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের এক ভাষাভাষী লোক যখন এক গ্রামে অভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে বসবাস করে তখন 'সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে' তেমন সত্যকে অবলম্বন করেই জীবনযাপন করতে হয়। এভাবে বংশপরম্পরাগত জীবনযাপনের মধ্যেই জাতিক চেতনা দানা বাঁধে। এই সমন্বয়ের মধ্যে বহু পরস্পর বিরোধিতা এমনকী বহু অসত্যও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু পল্লীবাসী সাধারণ মানুষ সেগুলো নিয়েই আপন-আপন আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী সাংসারিক

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও আমরা বাঙালি সমাজের এই সমন্বিত জীবনযাপনের প্রমাণ পাই। ড. দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত ও সম্পাদিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র কাহিনি কাব্যগুলোর রচনাকাল নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু স্পষ্টত মুসলিম আমলে রচিত কাহিনিগুলিতেও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির মানুষকে সংসারী সাধারণ মানুষের দোষ-গুণে ভূষিত করা হয়েছে। দরিদ্র ও উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি এবং শ্রেণি-স্বার্থান্ধ ধর্মান্ধ সমাজপতি এবং জালেম শাসক শ্রেণির প্রতি লেখকের ঘৃণাকে জাতীয়তাবোধ বলা যায় তাহলে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র পালাগান-রচয়িতাগণকে বাঙালি সমাজের হিতৈষী মানবতাবাদী লেখক বলতেই হবে। 'ব্রাহ্মণকুমার হৈল চণ্ডালের পুত' পরে মুসলমান 'পীরের অদ্ভুত কাণ্ড সকলি দেখিয়া, কঙ্কের পরাণ গেল মোহিত হইয়া...'। তারপর 'জাতিধর্ম সকলি ভুলিয়া পীরের প্রসাদ খায় অমৃত উক্তির মধ্যে একটি সমন্বিত জাতির উপাদান পাই। ড. দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, 'পূর্ব ময়মনসিংহে সেনরাজ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রভাব পৌঁছায় নাই। এইজন্য সপ্তদশ এমনকী অষ্টাদশ শতাব্দীর ছড়াগুলিতে আমরা ব্রাহ্মণ্য প্রভাব সংস্কৃতের অনুগত্য বিশেষরূপে দেখিতে পাই না। পূর্ব ময়মনসিংহের সাহিত্য বঙ্গদেশের অপরাপর অংশের সাহিত্যের মতো নহে। এখানে শাস্ত্রের অনুশাসন বাঙালির ঘরগুলিকে আঁটাআঁটি করিয়া বাঁধে নাই। এখানে পাষাণচাপা অত্যাচারের ফলে প্রেমে বিদ্রোহবাদের সৃষ্টি নাই, এখানে ঘরের জিনিসকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখা যায় নাই।... এইজন্য গীতিকাগুলির সর্বত্র দেখা যায় পুরুষ ও নারী নিজেরা বিবাহের পূর্বে পরস্পরকে আত্মদান করিয়াছেন, তারপর বিবাহ হইয়াছে।'

আমরা আরো একটু যোগ করে বলতে পারি যে, বহু কাল হতে বাংলাদেশে প্রচলিত লোক- কাহিনীগুলোও একই প্রমাণ দেয়। বাংলার সকল লোককাহিনী মানুষ, ভূত, প্রেত, দেও-দেওনী, রাজা উজির কোতোয়াল অথবা রাজপুত কোতোয়াল-পুত্রের কাহিনী। এগুলোতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প নেই। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে রচিত 'Folk Tales of Bengal'-এর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য লোককাহিনীর সংকলনগুলো তার প্রমাণ।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের জনসাধারণের গান-বাজনা, তাল, সুর, লয় এবং নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র প্রায় অভিন্ন। ভাটিয়ালি সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলের স্বর; ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, কীর্তন, জারি, মেয়েলি, গান কবিগান, বাউল, মুর্শিদা, মারফতি প্রভৃতি জাতীয় গীত সকল বাঙালি সানন্দে উপভোগ করে। নির্দিষ্ট কয়েকটি ধর্মানুষ্ঠান এবং মৃতের সৎকার-পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যতিরেকে বাকি সকল প্রকার উৎসব মেলা প্রভৃতি সকলের সমাবেশ হয়। দেশীয় খেলাধুলা—লাঠি খেলা, তরবারি ও রামদা-র খেলা, হাডুডু, দাইরা প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্রীড়া, বাসগৃহের সকল নির্মাণ-কৌশল, ভিতরের আসবাব, নকশি কাঁথা, শয্যা, তৈজসপত্র,

করে এবং একই ফসল ফলায়। উৎপাদন পদ্ধতিও অভিন্ন। ধর্মীয় বিধানের, বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ কয়েকটি দ্রব্য ব্যতিরেকে, ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙালির খাদ্য তালিকা ও পাকপ্রণালী অভিন্ন। বারবণিতা এবং বারবণিতালয়ে যারা যাতায়াত করে তাদের জাতকুল ধর্মভেদ নেই। অভিজাত শ্রেণির দরবারি পোশাক ছিল। ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাকি সকল বাঙালির পোশাক-পরিচ্ছেদ এখন হতে এক শতাব্দী আগেও ছিল নেংটি, গামছা, ধুতি, চাদর, লুঙ্গি, ফতুয়া, খড়ম ইত্যাদি। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি পল্লী রমণীর পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকারপত্র, প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি আগেও অভিন্ন ছিল। কিঞ্চিৎ উন্নতির পর, এখনও প্রায় অভিন্ন।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে আমরা কতকগুলো সাধারণ সিদ্ধান্তে আসতে পারি—(ক) চর্যাপদ রচিত হওয়ার পর, যে কারণেই হোক, কম পক্ষে আড়াই শো বছর বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়নি বললেই চলে; অনন্ত তার কোনো প্রমাণ নেই; (খ) স্বাধীন সুলতানি আমলের সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের নামকরণ হয় বাঙ্গালা এবং অধিবাসীরা বাঙালি পরিচয় লাভ করে; (গ) স্বাধীন সুলতান আমলেই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে সাহিত্য রচনা শুরু হয়। সুলতানগণ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বী সাহিত্যকর্মীর পৃষ্ঠপোষকতা করেন; (ঘ) বহিরাগত হলেও বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ বাংলাদেশকে স্থায়ী বাসভূমিরূপে গ্রহণ করেন। সুতরাং রাজনৈতিক কারণে হলেও এ দেশবাসী জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা তাঁদের কাম্য ছিল। এ কারণেই হয়তো তাঁরা বাংলা সাহিত্যের চর্চায় উৎসাহ দিতেন। কেননা, জাতিগত চেতনা-সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা স্থাপনের সর্বোত্তম মাধ্যম ভাষা। স্মরণীয় যে, গৌড়লক্ষ্মণাবতীর অধিপতী ও এদেশের স্থায়ী অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও পাল ও সেন রাজগণ বাংলা ভাষা নির্মাণ কার্যে সহায়তা করেননি; (ঙ) নানা মত দর্শন ও ধর্ম বিশ্বাসের সংমিশ্রণজাত সুফিবাদে বিশ্বাসী ধর্ম প্রচারকগণের প্রচারের ফলেই এদেশের জনসাধারণ ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বাংলাসহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও দেবমূর্তি ও মন্দির ভাঙার দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু তরবারির ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু তরবারির ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার দৃষ্টান্ত বিরল। যদি তাই হত তাহলে মুসলিম শাসনামলের কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং সংলগ্ন প্রদেশগুলোতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখতে পেতাম। প্রত্যন্ত প্রদেশ বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হত না; (চ) স্বাধীন সুলতানি আমলেই শ্রীচৈতন্যের মতো হিন্দু ধর্মসংস্কারক, সাধু সন্ন্যাসী এবং প্যানথিস্ট মতবাদী মুসলমান সুফিসাধকগণ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে যথাসম্ভব আচার-অনুষ্ঠানবর্জিত এক প্রেমভক্তিবাদী সমন্বিত লোকধর্ম প্রচার করেন। এই লোকধর্মে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মানুষে-মানুষে কৃত্রিম ভেদ (চতুঃবর্ণ প্রথা) বর্জিত হয়। ইসলাম ধর্মে তো তত্ত্বীয় বিচারে সকল মানুষের মর্যাদা সমান—পৃথিবীতে মানবজাতি আল্লাহতালার খলিফা বা প্রতিনিধি।

উপরিউক্ত সমন্বয়-প্রক্রিয়া মোগল রাজত্বের শেষাবধি (বাংলার নবাবী আমলসহ) অব্যাহত থাকে। আবদল হাকিম, আলাওল, ভারতচন্দ্র প্রমখের রচনায় আমরা তার

প্রমাণ পাই। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই সমন্বয়-প্রক্রিয়ার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় কবীর, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি প্রমুখের প্রতি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বীর শ্রদ্ধা-নিবেদনের মধ্যে। উচ্চকোটি শ্রেণিতে হিন্দু-মুসলমানের বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়। আকবর হতে শুরু করে প্রায় সকল মোগল সম্রাটের রাজপুত মহিষী ছিল। এদের কোনো একজনকে বলপূর্বক মোগল হেরেমে আনা হয়নি। আওরঙ্গজেবের রাজপুত মহিষী ছিল। সুতরাং আমরা এই অনুসিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের আত্মপরিচয়ের সূত্রপাত হয় স্বাধীন সুলতানি আমলে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে আত্মপরিচয়ের বৈশিষ্ট—অর্থাৎ বাঙালির বাঙালিত্বের চেতনা—আধুনিক জাতীয়তাবাদী চেতনার কাছাকাছি এসে পৌঁছে।

লেখক পরিচিতি : আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-৮৮)

জন্ম ১৯১১-র ১২ মার্চ, তৎকালীন ঢাকা জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ভাগ গ্রামে। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা তেমন করেননি—উচ্চ মাদ্রাসা পরীক্ষা পাশ করেছেন ১৯২৯-এ। ১৯৩২ থেকে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু। এরপর থেকে সাহিত্য ও সাংবাদিকতাই তাঁর ক্ষেত্র। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'কলাম' লিখতেন—১৯৭৫ থেকে দৈনিক 'সংবাদ'-এ অল্পদর্শী ছদ্মনামে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা' নামে কলাম লিখে গেছেন। অজস্র গল্প উপন্যাস নাটক ও ভ্রমণ কাহিনীর রচয়িতা। অনুবাদও করেছেন অনেক। 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' নামক সুবৃহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাসের লেখক তিনিই। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের বই : 'চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব-পাকিস্তানি সাহিত্য', 'সোচ্চার উচ্চারণ', 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস', 'মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি', 'লোকায়ত সমাজ ও বাঙালি সংস্কৃতি' ইত্যাদি। দুই খণ্ডে 'আত্মস্মৃতি'ও লিখেছেন। মৃত্যু : ১৯৮৮-র ২৪ আগস্ট।

'সুন্দরম্' পত্রিকার ১৩৯৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-কার্তিক (১৯৮৯) সংখ্যায় 'বাঙ্গালির আত্মপরিচয়' নামে যে প্রবন্ধটি ছাপা হয়, সংকলিত রচনাটি তারই অংশ বিশেষ। নামকরণ আমাদের।

ভাষা-সংস্কার ও বাঙালি চেতনার বিকৃতি

---*আহমদ শরীফ*

জন্ম-জীবন-মৃত্যু—এ কাল-পরিসরে মানুষের জীবন—তা ব্যক্তিক, সামাজিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি যে-কোনো প্রকারের হোক না কেন—সংকট-সমস্যা থেকে লাগাতার বা একটানা মুক্ত থাকতে পারে না। কোনো-না-কোনো বিষয় বা ক্ষেত্রে লঘু-গুরু কিছু সংকট-সমস্যা থাকেই। লাভ-লোভ-স্বার্থের ক্ষেত্রে নয়, কেবল, প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা বন্যা-খরা-শৈত্য-উষ্ণতা উষরতা-উর্বরতা-মারি প্রভৃতি সম্পৃক্ত বিপদ- বিপর্যয়ও মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক. সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবন কম ঘটে না। অতএব জীবিত মানুষের বাস সংকট-সমস্যার মধ্যেই সীমিত। সন্ত-সন্ন্যাসী-বিবাগী ঘরছাড়া মানুষের জীবন ও মন স্বাভাবিক নয়। কাজেই তাদের বিষয় আলোচ্য নয়। তারা আধিগ্রস্ত ব্যতিক্রম মাত্র। অতএব মৃতুতেই কেবল সংকট সমস্যার অবসান বা বিলুপ্তি সম্ভব, তার এক মুহূর্ত আগেও নয়।

তবু কথা থেকে যায়। সংকট-সমস্যা দু প্রকার—পরিহার্য ও অপরিহার্য, অমোঘ এবং কৃত্রিম ভাবে আরোপিত। আর্থিক, সামাজিক মান-যশ-খ্যাতি- ক্ষমতা-দর্প- দাপট- প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে নিতান্ত অজ্ঞ-অনক্ষর-উদাসিন লোককে প্রেরণা-প্রণোদনা-প্ররোচনা-উত্তেজনা-উদ্দীপনা বা উশকানি দিয়ে ব্যক্তিক বা দলীয় স্বার্থ বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করার মতো অমানবিক প্রচারে-প্রচারণায় মিথ্যাকে তথ্য ও ঘটনারূপে চালু করার মতো অপকর্ম অপরাধ। বাংলা ভাষায় প্রচ্ছন্ন শত্রু, বাঙালি সত্তার অভিন্নতা বিনাশে প্রয়াসী প্রচ্ছন্ন প্রবল শত্রু, আজও রয়ে গেছে। মা জন্ম দেয়, ভুমি জন্মমুহূর্ত থেকেই কোল দেয়, লালন করে জন্ম-জীবন-মৃত্যু, আশ্রয় ধাত্রী- ধরিত্রীতে এর কোলই। তাই মানি জন্মভূমি নয় শুধু, মায়ের বাড়া মাতৃভূমিই, মায়ের প্রয়োজন ফুরোয়, মাতৃভূমি মৃত্যুর পরেও দরকার হয়।

আজ আমরা তাই কেবল বাংলা ভাষার কথাই বলব। আঠারো শতকের শেষপাদ থেকে বিশ শতকের প্রথম পাদ অবধি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির উর্দুভাষী মুসলিম নেতাদের স্বার্থবুদ্ধি প্ররোচিত প্রচার-প্রচারণার ফলে দেশের বৌদ্ধ-হিন্দুজ নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের, নিম্নবিত্তের আর ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘরানা পেশাজীবী অজ্ঞ-অনক্ষর-স্বল্প শিক্ষিত মুসলিম সমাজে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল যে বাঙালি দুস্থ দরিদ্র নিঃস্ব নিরন্ন গ্রামীণ মুসলিমরাও তুর্কি-মুঘল শাসকগোষ্ঠীর কেবল স্বজাতি নয়, জ্ঞাতিও এবং তারা ব্রিটিশ পূর্ব যুগে ধনী-মানী-শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান ছিল। ব্রিটিশ সরকার, পাদ্রি ও ব্রিটিশ সহকারী ও সহযোগী হিন্দুরাই হিন্দুর ভাষা বাংলা মুসলিমদের উপর উনিশ শতকে চাপিয়ে দিয়েছে—রাজ্যচ্যুত শিক্ষিত মুসলিমরাও চাকরিচ্যুত হয়ে, জায়গির, ওয়াফক সম্পত্তি ও আয়মা সম্পত্তি হৃত হয়ে, কাজির পদ হারিয়ে, ইংরেজিকে প্রশাসনিক ভাষা করায় ফারসি-জানা উকিলরা পেশাচ্যুত হয়ে অজ্ঞ অনক্ষর দরিদ্র হয়ে যায়। এবং প্রজন্মক্রমে

এভাবে উপার্জনে বঞ্চিত এবং পিতৃ সম্পত্তি বণ্টনে দরিদ্রতর হয়ে হয়ে বাংলার মুসলিম সমাজ অজ্ঞ-অনক্ষর-হৃতসম্পদ ঐতিহ্যবিস্মৃত দুস্থ-দরিদ্র নিঃস্ব-নিরন্ন কুলি-মজুর-বর্গা চাষিতে পরিণত হয়েছে, আর প্রতিবেশী হিন্দুরা ব্রিটিশ কৃপায়-করুণায়-দয়ায়-দাক্ষিণ্যে আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে-পোষণে ও সহযোগিতায় অর্থ সম্পদের মালিক হয়ে মুসলিমদের মালিক-মনিব-প্রভু-শাসক-শোষক হয়ে দাঁড়িয়েছে শহরে-বন্দরে নয় কেবল, গাঁয়ে-গঞ্জেও।

এসব মিথ্যার জাল একালে ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ দিয়ে ছিন্ন করেছেন অনেকেই অনেক লেখায়। এখানে এ সবের পুনরুক্তি সম্ভব নয়। তবে কয়েকটি কথা সূত্র হিসেবে আমাদের মনে রাখা দরকার।

১. ইতিহাস বলে, তুর্কি-মুঘল আমলেও দেশজ-মুসলিমরা নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের নিম্নবিত্তের ঘরানা বৃত্তিজীবীই ছিল। তারা বর্ণহিন্দুর শাসনে-প্রশাসনেই ছিল। বর্ণ-হিন্দুরাই ইংরেজ আমলের মতো তখনো ছিল শিক্ষত প্রশাসক চাকুরে মহাজন ভৌমিক অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী।

২. পৃথিবীর কোথাও এ শতকের আগে শিক্ষিত শতে শতে মিলত না, বাঙালি মুসলিমদের এবং তাদের জ্ঞাতি শূদ্রদের মধ্যেও শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না।

৩. তাই রাজ্য-হারানো অভিমানে ও ব্রিটিশ বিদ্বেষ বশে মুসলিমরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেনি—এ তথ্যে কোনো সত্য নেই, বরং উর্দুভাষী শাসকগোষ্ঠীই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে ইংরেজি রাষ্ট্র ভাষারূপে চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণের আগেই। নওয়াব আবুদুল লতিফ প্রমুখের ইংরেজি শেখা নয় কেবল, মুর্শিদাবাদের নওয়াবের ১৮২৪ সনে ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আবেদনও তার প্রমাণ। আরও একটি সাক্ষ্য এই, ১৮৫৭ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮৬০ সন থেকে উর্দুভাষী প্রশাসকগোষ্ঠীর লোকেরাই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। প্রমাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার।

ব্রিটিশ বিদ্বেষ বশে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে বাধা থাকলে আরবি-ফারসি শেখার জন্যে কলকাতার মাদ্রাসায় ও হুগলি কলেজে বা অন্যত্র বাঙালি মুসলিম শিক্ষার্থী আবেদনে-নিবেদনেও মিলল না কেন? হিন্দুবৌদ্ধজ মুসলিম সমাজে বাংলা-আরবি-ফারসি শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়েনি—কখনো দরিদ্র ছিল বলে এবং শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না বলে খুব কম লোকই সাক্ষর ও শিক্ষিত ছিল তুর্কি-মুঘল আমলে।

৪. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মধ্যযুগে মুসলিম লিখিত কাব্যের ও ধর্ম সাহিত্যের হাতে- লেখা পাণ্ডুলিপি বা পুঁথি সংগ্রহ করে ও পরিচিতি লিখে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে দেশজ মুসলিমরা পনেরো-ষোলো শতক থেকে বাংলায় সাহিত্য চর্চা করেছেন বিশুদ্ধ বাংলায়, হিন্দুর মতোই। শুধু তা নয়, মহাভারত ও রামায়ণ থেকেই উপমাদি অলংকারও জোগাড় করেছেন তাঁরা। চৌদ্দ-পনেরো শতকের শাহ মুহম্মদ সগীর, ষোলো শতকের নবীবংশে রচয়িতা সৈয়দ সুলতান কিংবা সতেরো শতকের আলাওল দৌলত উজির বাহারাম খান. কাজী দৌলত প্রভতি সব কবিই

একালের বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতো ভাষাই প্রয়োগ করেছেন তাঁদের রচনায়। কাজেই ব্রাহ্মণ-পাদরিরা বাংলা গদ্য তৈরি করেছিল মাত্র। বাংলা ভাষার মূল চরিত্র ও ধারা বিকৃত করতে পারেনি। বাংলা ভাষা যে হিন্দুর ভাষা নয়, তা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৯০৩ সনেই আল ইসলাম পত্রিকায় সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগে উচ্চকণ্ঠে ও নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি সে-প্রবন্ধ বলেছিলেন যে বাংলা ভাষা মুসলিমের শুধু মাতৃভাষাই নয়, জাতীয় ভাষাও। আবার একই কথা ১৯১৮ সনেও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন।

৫. যারা বলে বাংলা এক সময়ে আরবি ভাষায় লিখিত হত, তারাও অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। এক সময়ে প্রায় ১৯৩০ সন অবধি মাদ্রাসায় বাংলার প্রবেশাধিকার ছিল না। আরবির ব্যাখ্যা-টীকাটিপ্পনী লেখা হত ফারসিতে কেতাবে হাশিয়ায় (মার্জিনে) এবং শিক্ষকরা তা শিক্ষার্থীদের তর্জমা করে দিতেন উর্দু ভাষায়। বঙ্গাক্ষরে অজ্ঞ কৌতূহলী মৌলবির জন্যে বাংলা কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ ক্বচিৎ কেউ ফারসি হরফে লিপ্যন্তর করত মাত্র। প্রমাণ :

চট্টগ্রামের কবি মুহম্মদ জান তাঁর 'নামাজ মাহাত্ম্য' পুথিতে লিখেছেন (১৮৫২ সনে) :

ক. 'আরবী আঙুলে যদি বাংলা লিখন। সত্তর নবীর বধ তাহার উপর।'

খ. আঠারো শতকের প্রথমপাদের কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'শরীয়তনামা'র লিপিকার বলেছেন : কন্ (কোন) হরফে কন্ (কোন) লফজ না বুঝি অর্থ/বাঙ্গালা অক্ষর হেরি আরবীর পুস্ত। (লিপিকার আলিজান)।

গ. হীন আফতাবুদ্দিন কহে আল্লা নবী/পূর্বের বাঙ্গালা অক্ষর আমি করিলাম আরবী। (সৈয়দ সুলতান রচিত রসুল চরিত্রের লিপিকার)।

উক্ত 'আল ইসলাম' পত্রিকায় ১৯০৩ সনেই পাদটীকায় আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেছিলেন যে, 'দোভাষী বাঙ্গালা শিক্ষিত লোকের ভাষা নহে।' ইত্যাদি। কাজেই বাংলা ভাষা চিরকালই দেশজ বাঙালি নির্বিশেষের ভাষা। হিন্দুরও নয়, মুসলিমেরও নয়। বাংলা ভাষা কলকাতার ও ঢাকার ভদ্রলোকের—শিক্ষিত লোকের লিখিত বাংলা ভাষা তেরো-চৌদ্দ-পনেরো শতক থেকেই অভিন্ন।

৬. আরবি ফারসি উর্দু ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ইব্রীয়দের হিব্রুর ও আরবির হিন্দি-বাংলার মতোই অভিন্ন উৎস ও ভিত্তি । আরবি ভাষা প্যাগান, কাফের, ইহুদি, খ্রিষ্টান নির্বিশেষে মাতৃভাষা ছিল ও আছে, ফারসিও তাই। ভারতে উর্দুও তাই। এ জন্যেই ইসলাম-পূর্বকালেও আমিনা, খাদিজা, মুহম্মদ, আবু তালেব, আবদুল্লাহ, আবদুল মুত্তালেব প্রভৃতি নাম চালু ছিল, দেখতে পাই। ফারসি নামগুলেও অমুসলিম-মুসলিম নির্বিশেষের মধ্যে চালু রয়েছে। কাজেই মুসমানি

৭. সাধারণ অজ্ঞতালোকেরা মনে করে, শাস্ত্রিক সামাজিক আচার-আচরণ, নীতি-নিয়ম, রীতি- রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি শাস্ত্রিক ভাবে মেনে চলাই, জীবনের রূপায়ণই, জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক সংস্কৃতি। অথচ সংস্কৃতিমানতা হচ্ছে নতুন চেতনায়, নতুন চিন্তায়, নতুন উদ্যমে, নতুন সৃষ্টিতে, নির্মাণে, জীবন যাত্রার সর্বক্ষেত্রে বস্তুগত ও জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিগত উৎকর্ষে ও প্রগতিতে। নবপল্লবের মাধ্যমে যেমন বেড়ে ওঠে বৃক্ষ, তেমনি বস্তুগত ও মানসসম্পদগত উৎকর্ষে বিবর্তন ধারা প্রবহমান জলস্রোতের মতো চেতনাচঞ্চল ও গতিশীল রাখে। অতএব সংস্কৃতি স্থির ও স্থায়ী ও স্থায়ী রূপের কিছু নয়। এ অর্থে স্থানিক ও জাতীয়ও নয়, সকল সংস্কৃতি মানবিক গুণেরই বিচিত্র বিকাশ।

৮. আর আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক বা রাষ্ট্রিকভাবে কেউ যদি হরফ বদলাতে, বানান বদলাতে, শব্দ বদলাতে, বাগ্‌বিধি বদলাতে চায় কোনো রাজনীতিক বা সাম্প্রদায়িক বদ-উদ্দেশ্যে, তা হলে তা হবে বাঙালি সত্তার, বাঙালি চেতনার বিকৃতি ও বিলুপ্তি ঘটানোর নামান্তর। মনে রাখতে হবে একালের বাংলাভাষী অঞ্চল কারুর একক ও প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল না কখনো। তবু আমাদের রক্তসাংকর্ষ, বর্ণভেদ ও শাস্ত্রভেদ সত্ত্বেও আমরা রশুনের মতো অভিন্ন মূল এক সংহত ভাষিক জাতি।

লেখক পরিচিতি : আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)

জন্ম ১৯২১-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রামের পটিয়া-র অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। ১৯৪৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ। তারপর ১৯৬৭-তে সেখান থেকেই পি-এইচ. ডি। প্রায় অজীবন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন এবং অবসর গ্রহণের পর অল্প কিছুকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। গবেষক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে প্রখ্যাত। তাঁর প্রকাশিত বই অজস্র। তার মধ্যে কয়েকটির নাম : 'বিচিত চিন্তা', 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ-স্বরূপ', 'বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য', 'বাংলা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব' ইত্যাদি।

সংকলিত রচনাটি ১৯৯৫-এ প্রকাশিত তাঁর 'সময় সমাজ মানুষ' বইতে 'ভাষা সংস্কারের নামে বাঙালি সত্তায় চির ধরানোর প্রায়াস' শিরোনামে ছাপা হয়েছিল। পরিবর্তিত নামকরণ আমাদের।

মার্চের স্বপ্ন

---*মুনতাসীর মামুন*

ভবিষ্যৎ হচ্ছে স্বপ্ন বা স্বপ্নের আরেক নাক হতে পারে ভবিষ্যৎ। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। প্রাণ দেয়। মানুষের পুরো জীবনটাই আসলে আবর্তিত হয় কোনো না কোনো স্বপ্নকে কেন্দ্র করে।

বাঙালি মুসলমান ১৯৪৭ সলে পাকিস্তান চেয়েছিল। কারণ তার মনে হয়েছিল পাকিস্তান হলে তার স্বপ্ন পুরণ হবে। এ স্বপ্ন প্রায় সমস্ত বাঙালি মুসলমানই দেখেছিল। কৃষক স্বপ্ন দেখেছিল সে ঋণ থেকে মুক্তি পাবে, জমি হবে তার। নিম্নবিত্ত স্বপ্ন দেখেছিল মধ্যবিত্তের আর মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের। স্বপ্ন দেখেছিল, চাকরির উমেদারির জন্য তাকে আর রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে না।

বাঙালি মুসলমানের সে স্বপ্ন ভাঙতে দেরি হয়নি। মুসলমান হলেই সব পাওয়া যায়, দেখা দেখা গেল এ কথা ঠিক নয়। আবার সব মুসলমানই সব কিছু পায় না। স্বপ্ন দেখে অনেকদিন থাকা যায়। কিন্তু, স্বপ্ন ভঙ্গ হলে বেশিদিন বাঁচা যায় না। বেঁচে থাকতে হলে আবার নতুন স্বপ্ন দেখতে হয় যা কষ্টকর। নাক হলে হতাশা যার অন্য নাম মৃত্যু।

পাকিস্তানের স্বপ্ন ভঙ্গের পর আওয়ামী লিগের ছয়-দফা স্বপ্ন দেখিয়েছিল বাঙালিকে। সেই ছয়-দফা এক-দফা হয়েছে। বাঙালি আবার স্বপ্ন দেখেছে নতুন রাষ্ট্রের যার নাম হবে বাংলাদেশ। ওই স্বপ্ন যদি আমরা না দেখতাম তাহলে আমাদের সন্তানরা দাস হিসেবেই বেঁচে থাকত। কে চায় তার সন্তান বেঁচে থাকুক ভৃত্য হয়ে? চায় না দেখেই তো সে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু, আজকের প্রজন্ম মনে হয় তেমনভাবে জানে না ওই স্বপ্ন দেখার জন্য কত পরিবার নিঃস্ব-ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা জানে না মুক্তির জন্য বাংলাদেশকে কী মূল্য দিতে হয়েছে। তারা কি কখনো শুনেছে জোন বেজের গলায় সে গানটি—'অস্তগামী সূর্যের শেষ রেশ, লক্ষ মানুষ নিহত, এই তো বাংলাদেশ'? যদি তারা নিস্পৃহ থেকে থাকে তবে সে জন্য আমরা দায়ী। যারা স্বপ্ন দেখে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমরা তাদের মনে রাখিনি। মনে রাখলে, আজকের প্রজন্মেরও অহরহ মনে পড়ত কী স্বপ্ন, কেন আমরা দেখেছিলাম ১৯৭১ সালে।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন ওই দিনটি পালিত হবে 'লাহোর প্রস্তাব দিবস' হিসেবে। ছুটিও ঘোষণা করেছিলেন তিনি সেদিন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ দিনটিকে ঘোষণা করে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে। দিনটি কিন্তু সবাই পালন করেছিল প্রতিরোধ দিবসের আবেগ নিয়েই। সেদিন ঢাকার রাজপথে ছিল সবাই পালন করেছিল প্রতিরোধ দিবসের আবেগ নিয়েই। সেদিন ঢাকার রাজপথে ছিল শুধু মিছিল। শেখ মুজিবের

চোখে স্বপ্ন। তাই সেদিন ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া দেশে পাকিস্তানি পতাকা ওড়েনি। এমনকী বিদেশী দূতাবাসেও। পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত যাতে প্রতিরোধ দিবসে না বাজাতে হয় সে জন্য ঢাকা টেলিভিশন অনুষ্ঠান চালিয়েছিল বারোটা নয় মিনিট পর্যন্ত। বারোটার পর চব্বিশ তারিখ। তখন বেজেছিল পাক সার জামিন শাদবাদ। মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকার পাশাপাশি উড়েছে শোকের কালো পতাকা। শেখ মুজিবকে সেদিন আবার বলতে হয়েছে—'শক্তির জোরে আর বাঙালিদের দাবায়ে রাখা যাবে না। বাংলার মানুষকে আর পরাধীন রাখা যাবে না।' স্বপ্নের সঙ্গে ছিল ক্রোধ। সে ক্রোধের জন্ম ১৯৬৯ সালে। এবং সে কারণে ওই সময় অধিকাংশ বাঙালি তরুণকে ফেরানো যায়নি রাজপথ থেকে।

১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধের স্মৃতি একেক জনের কাছে একেক রকম। যারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করেছেন তাদের কাছে এক রকম। যারা প্রবাসী বা বাস্তুহারা তাদের কাছে একরকম। আর যারা ছিলেন দেশের ভেতর তাদের কাছে একরকম। তবে ঐক্যের সূত্র ছিল একটি। সেটি হল পশ্চিম পাকিস্তানের দখলদারির অবসান। এক ধরনের সোনার বাংলার স্বপ্নও ছিল। স্বপ্নের উপাদানগুলো অবশ্য পরিষ্কার নয়। তবে মোটামুটিভাবে সোনার বাংলা হিসেবে আমরা ভাবতাম :

- যেখানে দুবেলা খাব, শান্তিতে স্বস্তিতে নিজের মতো থাকব;
- মিলিটারি আর অস্ত্র দেখিয়ে দেশ শাসন করার সাহস পাবে না;
- রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর জুলুমবাজি থামবে; ইত্যাদি।

আজ ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে, তেইশ বছর পর দেখি সে সব স্বপ্নের অধিকাংশ পুরণ হয়নি। কিন্তু জানি, তা পুরণ হবেই। আজকের জেনারেশনকে নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে হবে না, তারা স্বপ্ন দেখবে সে সব ইচ্ছা পূরণের যা আমরা করতে পারিনি। আমি ভাবছি, এই মার্চে যারা আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রাণ দিলেন তাদের জন্য আমরা কী করেছি? যদি আমরা কিছু না করি তাহলে কী দেখে স্বপ্ন দেখবে নতুন প্রজন্ম?

পৃথিবীর সব দেশে সফল স্বাধীনতা সংগ্রামের পর প্রথম যে কাজটি করা হয়, তা হল, জাতীয় বীরদের প্রতি স্মৃতি তর্পণ। অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিই, আমাদের শত্রু বলে কথিত ভারতের প্রতিটি শহরে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মৃতিস্তম্ভ, ভাস্কর্য আছে। এভাবেই এক প্রজন্ম আরেক প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে যায় দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, গৌরবগাথা। তখন দেশে শত ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা থাকলেও ইতিহাসের বিকৃতি হয় না।

একমাত্র বাংলাদেশই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। যখন যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতা-বিরোধীদের সম্মানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি করা হয় তখন এ জাতি তা মেনে নিয়েছে। সচেতনভাবে। মুক্তি যুদ্ধের স্মারকচিহ্নসমূহ অপসারণ অথবা অবহেলা করেছে যাতে সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভাবতে পারেন যে, স্বাধীনতার পঁচিশ বছর হতে চলল, কিন্তু

স্বাধীনতা-জাদুঘর হয়নি, অথচ ঢাকা শহরের সবচেয়ে সুন্দর ও দামি জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে সামরিক জাদুঘরের জন্য।* এবং এ জন্য এ জাতি যেন লজ্জিতও নয়। লজ্জিত হলে স্বাধীনতা পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো এ নিয়ে বিবৃতি দিত। অথচ বক্তৃতা বিবৃতিতে তারা যা বলে তার মূল কথা হল সেই 'অস্তগামী সূর্যের শেষ রেশ, লক্ষ মানুষ নিহত, এই তো বাংলাদেশ।' পাকিস্তানি হানাদার-বাহিনী যেখানে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং যা অবস্থিত ঢাকার কেন্দ্রস্থলে, সেখানে কোনো বিজয়-স্মারক নির্মিত হয়নি, কিন্তু জিয়া-আমলে নির্মিত হয়েছে শিশু-পার্ক। বাংলাদেশের কোথাও কি কোনো রাস্তার নামকরণ হয়েছে তাজউদ্দিন আহমদের নামে?

এ দেশে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা নিয়ে অনেক প্রহসন হয়েছে, কিন্তু রাজাকারদের তালিকা প্রণীত হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরশ্রেষ্ঠ থেকে বীরপ্রতীক—যে ৬৭৪টি পদক দেয় হয়েছে তার মধ্যে ১৭৬টি পদক মাত্র দেয়া হয়েছে সাধারণ মানুষদের, বাকি সব সামরিক বাহিনীর সদস্যদের। এ মন্তব্য কারো অবদানকে খাটো করে দেখার জন্য নয়, এ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাবার জন্য।

এ সমস্ত কর্মকাণ্ড হয়েছে আমাদের বা মধ্যবিত্তের নেতৃত্বেই। এর ফলে কায়েম হয়েছে প্রগতি-বিরোধী শাসন। প্রায় ক্ষেত্রেই আমরা নিশ্চুপ থেকেছি, আপোস করেছি। কারণ আমরা সবাই এর বিনিময়ে ইউনিফর্মধারী ও ইউনিফর্মহীন কিন্তু ইউনিফর্ম প্রভাবিত শাসকদের কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছি।

প্রত্যেক জাতির জাতীয় বীর থাকে। আমাদের নেই। থাকলেও আমরা স্বীকার করি না। ১৯৬৯ থেকে যদি আমরা মুক্তির পর্যায় ধরি তা হলে ফারুক ইকবাল হচ্ছেন সেই নিরস্ত্র ছাত্রনেতা যাকে সামনাসামনি হত্যা করা হয়েছে। বা অধ্যাপক শামসুজ্জোহা? বা আসাদুজ্জামান বা মতিয়ুর? এরা কিন্তু আমাদের সেই স্বপ্নকে আদর্শে পরিণত করেছিলেন এবং তর জন্য নিজেদের ভবিষ্যৎ সমর্পণ করেছিলেন। তাঁদের জাতীয় বীরের মর্যাদা দেয়া দূরে থাকুক, তাঁদের নামে ঢাকায় বা অন্য কোথাও কোনো সড়কেরও নামকরণ করা হয়নি। বঙ্গভবনের সামনের পার্কটি শহিদ মতিয়ুর শিশুপার্ক নামকরণ করা হয়েছিল কিন্তু পৌরসভা বা রাষ্ট্র তার স্বীকৃতি দেয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সার্জেন্ট জহুরুল হকের নামে একটি হলের নামকরণ করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক জোহার নামে। একমাত্র আসাদ গেইট টিকে আছে। এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় বীরদের প্রাপ্য!

তাহলে কী দেখে নতুন প্রজন্ম শিখবে বা স্বপ্ন দেখবে বা অনুসরণ করেবে?

এত কিছু বলার পরও আমি হতাশ তা বলব না। আমাদের স্বপ্নের কিছুটা বাস্তবায়ন হচ্ছে। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, বাংলাদেশ হয়েছে। এখন জাহানারা ইমাম এই মার্চে আমাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন—তা হল

---

* পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্টের পরিচালনায় তৈরি হয়েছে 'মুক্তি মঞ্চ জাদুঘর'। স.।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের। আমাদের জেনারেশনের একটি বড় স্বপ্ন এর বাস্তবায়ন করা। এতে সমাজের অনেক টেনশন, দ্বন্দ্ব হ্রাস পাবে। ওই যে 'অস্তগামী সূর্যের শেষ রেশ, লক্ষ মানুষ নিহত' তারা শান্তি পাবে। বস্তুত ঘাতক-দালাল-নির্মূল কমিটি গত তিন বছরে আমাদের যথেষ্ট পুনরুজ্জীবিত করেছে। একটি বিষয় পরিষ্কার, রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা আছেন তারা কখনো মুক্তি যুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবেন না। এটি আমাদেরই করতে হবে। কারণ, এ সরকারের কর্ণধার ব্যা. না. হুদা বা আ.ম. চৌধুরীর কাছে এসব বিষয়ে যে কোনো আবেদন আত্মমর্যাদা হানিকর। জাহানারা ইমাম বিকল্প পথের নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন অঞ্চলে শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ গড়ে উঠছে, শহিদের নামে রাস্তার নামকরণ হচ্ছে, মুক্তি যুদ্ধের বই বিক্রি বেড়েছে, সব নির্বাচনে জামায়াত প্রার্থী জামানত হারাচ্ছে। রাজাকার শব্দটি অবমাননাকর গালিতে পরিণত হয়েছে। এসব এক সময় পূর্ণতা পাবে, সেটিই আমাদের জোনারেশনের স্বপ্ন। মার্চ মাস গৌরবের মাস। ৭ মার্চ আস্তগামী সূর্যের রেশ ধরে উচ্চারিত হয়েছিল স্বাধীনতার ঘোষণা। ১৭ মার্চ বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মদিন। ২১ মার্চ মাস্টারদা সূর্য সেনের জন্মদিন যিনি তখন অকুতোভয়ে চট্টগ্রামে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ মুক্ত করতে চেয়েছিলেন আর ২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। এ বছর প্রতিটি দিন বিপুলভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৭ মার্চ দূরদূরান্ত থেকে মানুষ টুঙ্গিপাড়ায় ভিড় জমিয়েছে। মধুর ক্যান্টিনে ছাত্র লিগ মিষ্টি বিতরণ করেছে এবং সব দলের ছাত্ররা তা হাসি মুখে নিয়েছে। মাস্টারদার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একদিকে যেমন তার বসতভিটা আক্রান্ত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে জাঁকালোভাবে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ২৬ মার্চ আটজন যুদ্ধাপরাধীর বিষয় জানানো হবে নতুন প্রজন্মকে। আশা করছি এই উদ্দীপনা আরো বাড়বে আর আশার আরেক নামই তো স্বপ্ন আর এটিই হোক আমাদের মার্চ মাসের স্বপ্ন।

লেখক পরিচিতি : মুনতাসীর মামুন (১৯৫১-)

জন্ম ১৯৫১-র ২৫ মে, ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ. ১৯৭২-এ এবং পি- এইচ. ডি. ১৯৮৩-তে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এক সময় গল্প লিখেছেন, শিশু সাহিত্য ও অনুবাদে তাঁর অবদান আছে—তবে নানা বিষয়ে লেখালেখি, বিশেষত ঢাকার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা ও প্রবন্ধের সংখ্যা বিপুল। কয়েকটি প্রবন্ধের বইয়ের নাম : 'স্মৃতিময় ঢাকা', 'উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র', 'উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ', 'পুরোনো ঢাকার উৎসব ও ঘরবাড়ি', 'ঢাকা : স্মৃতিবিস্মৃতির নগরী', 'ঢাকার হারিয়ে যাওয়া ছবির খোঁজে', 'মিছিলে কেন ছিলাম' ইত্যাদি।

সংকলিত রচনাটি ১৯৯৬-এ প্রকাশিত তাঁর 'বাংলাদেশে ফেরা' বই থেকে গৃহীত। সেখানে রচনাকাল দেওয়া আছে : ২২ মার্চ ১৯৯৪।

অভিভাষণ

—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

দয়াময় খোদা তাআলার অসংখ্য ধন্যবাদ, আমরা আজ এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রাদেশিক রাজধানীর বুকে মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত মানুষরূপে সমবেত হতে সক্ষম হয়েছি। জাহাঙ্গীর, শায়েস্তা খান, ইসলাম খান ও আযীমুশ্‌শানের স্মৃতিবিজড়িত জাহাঙ্গীরনগর ঢাকা আজ আজাদ পূর্বপাকিস্তানের রাজধানী। ঢাকার নিকটবর্তী পূর্ববঙ্গের এককালীন রাজধানী সোনারগাঁও ন্যায়বান বাদশাহ্ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের পুণ্য স্মৃতি আজও বুকে ধরে আছে। স্মৃতি আমাদের নিয়ে যায় ঢাকার অদূরবর্তী বিক্রমপুরে সেন রাজাদের শেষ রাজধানীতে, যেখানে একদিন লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন ও মধু সেন রাজত্ব করেছিলেন। দূর স্মৃতি আমাদের টেনে নিয়ে চলে বিক্রমপুরের সন্নিকট রাজা রামপালের স্মৃতিচিহ্ন—রামপাল এবং বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত শীলভদ্র, কমলশীল ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের স্মরণপূত অধুনা-বিস্মৃত জন্মভূমিতে। এই অঞ্চল যেমন বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানের স্মারকলিপি হয়ে আছে, প্রার্থনা করি তেমনই এ যেন নূতন রাষ্ট্রের জাতি-বর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিকের মিলনভূমি হয়। আমীন।

আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতির নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই। নৃতাত্ত্বিক গবেষণার অণুবীক্ষণ যন্ত্র চোখে ধরে হয়তো আবিষ্কার করতে পারেন, কার শরীরে দুচার ফোঁটা বেশি বা কম আর্য, আরব, পাঠান বা মোগল রক্ত আছে। কিন্তু ঋষিকবির কথাই ঠিক—

হিথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

পূর্ববাংলার বিশেষ গৌরব এই যে, এই প্রদেশের প্রাচীন নাম বঙ্গাল থেকে সমস্ত দেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাংলা। এই বহগাল নাম পাই আমরা রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ লিপিতে (১০২৩ খ্রি.)। বৌদ্ধ যুগের কবি ভুসুক একটি চার্যাগীতিতে বলেছেন—

বাজ-ণাব পাড়ী পউআঁ খালেঁ বাহিউ।
অদ্বয় বঙ্গাল দেশ লুড়িউ।।

বজ্রযানরূপ নৌকায় পাড়ি দিয়ে পদ্মার খালে বাইলাম। অদ্বয়-রূপ বঙ্গাল দেশ লুট করলাম।—এতে বুঝতে পারি যে, পদ্মা নদীর পারেই হল বঙ্গাল দেশ। 'বঙ্গাল' আমাদের নিন্দার কথা নয়, এই দেশবাসীর প্রাচীন নাম। সীরাজের অমর কবি হাফিজ

সোনারগাঁও-এর সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্‌কে যে গজল কবিতা উপহার পাঠিয়েছিলেন, তাতে বলেছেন—

শক্কর-শিকন শওন্দ হমা তূতীয়ানে হিন্দ।
যে কন্দে পারসি কে ব-বঙ্গালা মী রওদ।
—ভারতের তোতা হবে চিনি-খেকো সকলি।
পারসির মিছরি এই যে বাঙ্গালায় চলিছে।।

কেবল হাফিজ নন, মিথিলার বিদ্যাপতিও বাংলার এই সুলতানকে প্রশংসা করেছেন—'মহলম জুগপতি চিরজীব জীবথু গ্যাসদীন সুলতান'।

মালব, কর্নাট প্রভৃতি দেশের নামের ন্যায় এই বঙ্গাল দেশও সংগীতশাস্ত্রের এক বিশেষ রাগের নামকরণ করেছে। ভুসুক একটি চর্যাগীতি এই বহগাল রাগে রচনা করেছেন।

পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, এই দেশ থেকেই বাংলা সাহিত্য এবং নাথপন্থের উৎপত্তি হয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ যেমন বাংলার আদিম লেখক, তেমনি তিনি নাথপন্থের প্রবর্তক। তাঁর নিবাস ছিল ক্ষীরোদ সাগরের তীরে চন্দ্রদ্বীপে, বর্তমানে সম্ভবত যাকে সন্দ্বীপ বলে। ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে উপস্থিত হন।... মৎস্যেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কানুপা, কুক্করীপা, ডোম্বী, সরহ, শবরী প্রভৃতি বহু সিদ্ধাচার্য চর্যাগীতি বা পারমার্থিক গান রচনা করেন। তার কতকগুলি আমরা পেয়েছি। এই গানগুলির একটি বিশেষত্ব পদের শেষে ভণিতা। ...এই ভণিতার রীতি প্রাচীন বাংলা থেকে সংস্কৃতে যায়, যেমন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'। সমস্ত মহাজন পদাবলি চর্যাগীতির বৈষ্ণব সংস্করণ। নাথপন্থের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চর্যাগীতির রীতি পঞ্জাব পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতের পারমার্থিক গানে চলতে থাকে। পঞ্জাব থেকে এই রীতি পারস্যে যায়। ফারসি গজল আরবির অনুকরণে নয়। তা চর্যাগীতিরই অনুকরণে।...

এই পূর্বাঞ্চলের ভীম, দিব্যোক, ঈসা খান, চাঁদ রায় প্রভৃতি বীরেরা সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। পূর্ববঙ্গের সাহসী সন্তানেরা শুধু আজ নয়, প্রাচীন কাল থেকেই সমুদ্রযাত্রায় নির্ভীক। এরাই একদিন সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ, কাম্বোডিয়া এবং বর্নিও পর্যন্ত সাগরে পাড়ি দিত। মহাকবি কালিদাস নৌবিদ্যায় দক্ষ বঙ্গবাসীর উল্লেখ করেছেন। কবিকঙ্কণ প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করেই ধনপতি সদাগরের জাহাজের মাঝিমাল্লাদিগে পূর্ববঙ্গবাসী বলে বর্ণনা করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাংলার ছাপ রয়েছে। বাংলার উপকথা এখনও সেখানে প্রচলিত আছে। বাংলার রক্ত যে তাদের রক্তের সঙ্গে মেশেনি, তা কে বলতে পারে? জাভার বরবুদুরের স্থাপত্য উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরের মঠের স্থাপত্যের অনুকরণে।

প্রাচীন রাঢ়, ররেন্দ্র এবং বঙ্গ নিয়েই আমাদের বাংলাদেশ। রাঢ় ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আঁকড়ে ছিল। সেখানে শূরবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বংশের আদিশূর বাইরে থেকে

ব্রাহ্মণ আমদানি করে হিন্দুত্বকে বাঁচিয়ে রাখেন। শূরবংশের পর সেনবংশ এই রাঢ় থেকেই রাজত্ব বিস্তার করেন। তাঁরাও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বল্লাল সেন কৌলীন্যপ্রথা চালিয়ে আদিশূরের ধারাকে স্থায়ী করেন। তুর্কিদের বাংলা বিজয়ের সূত্রপাত রাঢ় থেকে হলেও এখানে ইসলাম তেমন বিজয়ী হতে পারেনি। বরেন্দ্র ও বঙ্গ মুসলিম আক্রমণের প্রাক্‌কালে বৌদ্ধ বা নাথপন্থী ছিল। তারা সনাতনপন্থীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল। এমন সময়ে আসে তুর্কিদের হামলা। তারা এই বিদেশীদের রক্ষাকর্তা মনে করে বোধহয় সাহায্য করেছিল এবং পরে সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাই আজ পূর্বপাকিস্তান হওয়া সম্ভবপর হয়েছে।...

পরবর্তী কালে কিছু-কিছু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করলেও পূর্বপাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমান যে বৌদ্ধবংশজাত, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার বৌদ্ধ নাথপন্থীদের প্রধান উপাস্য ছিল শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন। কানুপা তাঁর দোহায় বলেছেন—

লোক গর্ব বলে বেড়ায় যে আমি পরমার্থে প্রবীণ।
কোটির মধ্যে একজন যদি নিরঞ্জনে লীন হয়।।

প্রাচীন মুসলমান লেখকেরা কেহই ঈশ্বর বা ভগবান আল্লাহ-র প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেননি। কিন্তু তাঁরা নিরঞ্জন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটি বৌদ্ধ-উৎপত্তির একটি বলবৎ প্রমাণ। ইসলাম জাতপাত মানে না। মানুষ মাত্রেই আদমের সন্তান এবং সমান। কুরআনের বাণী 'ইয়া আক্‌রামাকুম্ ইন্নাল্লাহি আত্‌ক্বাকুম্'—নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে সকলের চেয়ে বেশি ধার্মিক, সে আল্লাহ্-র নিকট সকলের চেয়ে বেশি সম্মানিত। কাজেই আমরা বংশ দেখি না, আমরা দেখি গুণ। বাংলার মুসলমান যদি গুণে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, তবে আরব, পারস্য, তুর্কি, হিন্দুস্থান প্রভৃতি পৃথিবীর যে কোনো দেশের মুসলমানের চেয়ে সে কেন নিকৃষ্ট হবে? কবি হাফিজ কেমন সুন্দর বলেছেন—

রাজার মুকুট চাও যদি নিজ গুণের প্রকাশ করো
হও ফরীদুন জমশীদের বা যদি বংশধরও।।

স্বাধীন পূর্ববাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্ব শাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য। এই সাহিত্যে আমরা আজাদ পাক-নাগরিক গঠনের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুশীলন চাই। এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। পৃথিবীর কোনো জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হতে পারেনি। ইসলামের ইতিহাসের একেবারে গোড়ার দিকেই পারস্য আরব্য কর্তৃক বিজিত হয়েছিল, আরবি সাহিত্যেরও চর্চা করেছিল। কিন্তু তার নিজের সাহিত্য ছাড়েনি। ...বাংলা সাহিত্যের চর্চা আমাদের মধ্যে আজ নূতন নয়। বাংলাদেশ যখন দিল্লির অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে গৌড়ে এক স্বাধীন সুলতানাত্ প্রতিষ্ঠা করে, তখন থেকেই বাংলাসাহিত্য সৃষ্টির দিকে রাজার মনোযোগ পড়ে। ইউসুফ শাহ্, নসরত শাহ্, নিজাম শাহ্ শূর, ছুটি খাঁ, পরাগল খাঁ প্রভৃতি রাজা ও রাজপুরুষগণ বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন।

হিন্দু কবিরা মুক্তকণ্ঠে তাঁদের যশ কীর্তন করে গেছেন। কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এক গৌড়েশ্বর। তাঁর প্রশংসায় কবি বলেছেন—

পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।।..

সম্ভবত বাংলা ভাষার আদি মুসলিম লেখক জয়নুদ্দীন। তাঁর 'রসুল বিজয়' ইউসুফ খানের উৎসাহে রচিত হয়। এই ইউসুফ খানকে কবি 'রাজরত্ন' ও 'রাজ্যেশ্বর' বলেছেন। এতে সন্দেহ নেই যে, এই বাদশাহই মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। 'রসুলবিজয়' শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামের অনুকরণ বলেই মনে হয়। এর পরে আমরা পাই সৈয়দ সুলতানকে। তিনি 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'ওফাতে রসুল', 'নবী বংশ' এবং 'শবে মিরাজ' নামে চারটি কাব্য রচনা করেন। এই শেষোক্ত কাব্যের রচনাকাল ৯০৬ হিজরি বা ১৫০০ খ্রি.। আলী রাজা মারফতি সাধনতত্ত্ব বিষয়ে চারখানা বই রচনা করেছেন—'সিরাজকুলুপ', 'জ্ঞানসাগর' 'যোগকালন্দর' এবং 'ধ্যানমালা'। অপর দুই জন মুসলিম কবি সাবিরিদ খান ও শেখ চান্দ 'রসুলবিজয়' নামে দুখানি কাব্য রচনা করেন। এ কাব্য দুইটি জয়নুদ্দীনের 'রসুলবিজয়ে'র অনুসরণ বলে মনে করা যেতে পারে। সাবিরিদ খান একখানি বাংলা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যেরও লেখক। এই কাব্য থেকে তাঁর সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শেখ চান্দ 'শাহদৌলা ফকিরের পুঁথি' রচনা করেন। ইঁহারা খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছিলেন। বাংলার পাঠান যুগের শূর রাজবংশের নিজাম শাহ্ শূরের রাজত্বের সময় চট্টগ্রামের দৌলত উজীর বাহরাম খাঁ 'লায়লী-মজনু' নামে একটি কাব্য রচনা করেন. ইনি বাংলার স্বাধীন পাঠান যুগের শেষ কবি।

তারপর বাংলা যখন আকবরের রাজত্বের সময় দিল্লির অধিকারভুক্ত হয়, তখন বাংলার মুসলমানের লেখা তেমন উল্লেখযোগ্য পুস্তকের সন্ধান পাই না। এই সময় কিন্তু আরাকান রাজাদের আশ্রয়ে বাংলার এক প্রান্তে চট্টগ্রামে ও আরাকানে বাংলা সাহিত্যের চর্চায় মুসলমান লেখকেরা খ্যাতি উপার্জন করেন। আরাকানরাজ শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালে (১৬২২-৩৬ খ্রি.) মন্ত্রী আশরাফ খানের আদেশে কাজী দৌলত 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহাই মধ্যযুগের সর্বপ্রথম মৌলিক ও লৌকিক কাব্য। কাজী দৌলত পুস্তকের অসমাপ্ত অবস্থায় মৃত্যুগ্রস্ত হলে কবি আলাওল তার অবশিষ্টাংশ রচনা করেন। আলাওল প্রধানত কাব্য-অনুবাদক ছিলেন। তিনি হিন্দি থেকে 'পদ্মাবতী' এবং ফারসি থেকে 'সেকান্দারনামা', 'হফত-পয়কর' ও 'তোহ্ফা' পুস্তকের অনুবাদ করেন। 'সয়ফুল মুলুক বদীয়ুজ্জমাল' তাঁর মৌলিক রচনা, যদিও কাব্যের বিষয়বস্তু আরবি ও ফারসি হতে ধার নেওয়া। তাঁর সমসাময়িক মুহম্মদ খান 'মকতুল হোসেন' নামে কারবালার ঘটনা অবলম্বনে এক কাব্য লেখেন। মৌলিক কবি হিশাবে মুহম্মদ খানকে আলাওলের উপর স্থান দিতে হয়। আলাওলের সমকালে সৈয়দ মুহম্মদ আকবর (জন্ম ১৬৫৭ খ্রি.) 'জেবল মুল্লুক সমারোখ' ও 'শাহদৌলার পুঁথি' নামে দুখানি কাব্য রচনা করেন। আলাওলের পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর 'চন্দ্রাবতী' নামে একটি কাব্যের রচয়িতা।

আরাকানে মুসলমান-প্রভাব নষ্ট হবার পরে বাংলাদেশে যখন অর্ধ-স্বাধীন সুবাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আবার বাঙালি মুসলমানের মধ্যে সাহিত্যের চর্চা দেখা দেয়। এই সময়ের প্রধান লেখক উত্তরবঙ্গের ঘোড়াঘাট নিবাসী হায়াত মাহমুদ। তিনি 'মহরম পর্ব', 'জঙ্গনামা', 'আম্বিয়াবাণী', 'চিত্ত উত্থান' ও 'হিতজ্ঞান' প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্য রচনা করেন। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান লেখকেরা ফারসি-উর্দুমিশ্রিত তথাকথিত মুসলমানি বাংলায় ধর্ম সম্বন্ধে নানা পুঁথি রচনা করেন। এখন অনাদৃত হলেও একসময়ে সেগুলি নায়ের মাঝি থেকে ঘরে বউঝি পর্যন্ত সকলকে আনন্দ ও উপদেশ দান করত। আমরাও ছোটবেলায় আমাদের ২৪-পরগনার নিভৃত পল্লীতে ঝিল্লিমুখর বহু সন্ধ্যায় সুর-করে পড়া 'আমীর হামজা', 'হাতেম তাই', 'কসাসুল আম্বিয়া' প্রভৃতি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি।

'গোরক্ষ-বিজয়ে'র কবি পূর্ববঙ্গবাসী ফয়জুল্লাহ্ এবং 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে'র কবি উত্তরবঙ্গবাসী আবদুশ শুকুর মহম্মদ। এঁরা যেমন প্রাচীন নামপন্থের ধারা রক্ষা করেছেন, সেইরূপ বহুসংখ্যক মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলি রচনা করেন। এঁদের অনেকের ধারণায় রাধা-কৃষ্ণ দেহ ও আত্মা কিংবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক। কেউ বা নিছক প্রেমকবিতারূপেই পদাবলি রচনা করেছিলেন। তবে দু-একজন যে যবন হরিদাসের মতো বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না। বিখ্যাত আলওলও কয়েকটি বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেন। প্রায় শ খানেক মুসলমান পদকর্তার সন্ধান আমরা পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে আকবর শাহ, করম আলী, নসীর মাহমুদ, ফকীর হবীর, ফতন, শেখ লাল, সৈয়দ মর্তুজা এবং সাল বেগের নাম প্রসিদ্ধ। কত মারফতি ও মুরশিদি গান যে বাংলার ফকিরেরা রচনা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কে সেগুলি সংগ্রহ করবে?

পল্লীগীতিকায় মুসলমানের দান অতি মহৎ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্যে জ্যেষ্ঠ সহোদরকল্প পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও উৎসাহে যে গাথাগুলি সংগৃীত হয়েছে, তা ছাড়া আরও বহু পল্লীকবিতা পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববঙ্গের সরকার কি এদিকে মনোযোগ দিবেন? এই পল্লীকাব্য সম্বন্ধে দীনেশবাবু বলেছেন, 'এই বিরাট সাহিত্যের সূচনা আমি যেদিন পাইয়াছিলাম, সেদিন আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। আমি সেদিন দেশমাতৃকার মোহিনীমূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আমাদের বাংলা ভাষার শক্তি ও প্রসার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং হিন্দু ও মুসলমানের যে যুগলরূপ দেখিয়াছিলাম তাহাতে চক্ষু জুড়াইয়া গিয়াছিল।' এ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৪টি পল্লীগাথা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে ১৩টি মুসলমান কবির রচিত।

গত ব্রিটিশ যুগের ও বর্তমানের মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার কথা সকলের সুবিদিত। সুতরাং এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন আছে আদি কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার বিস্তৃত ইতিহাস লেখা এবং প্রাচীন মুসলিম লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশ করা। আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুরা কি এদিকে অবহিত এবং অগ্রসর হবেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সরকারের অবশ্য কর্তব্য

পূর্ববাংলার সকল স্থান থেকে পুঁথি, পল্লীগীতি, পল্লীকাব্য ও উপকথা সংগ্রহ করে রক্ষা করা। বিদ্যালয়ের পুঁথিবিভাগকে আরও সমৃদ্ধি করতে হবে। মোটকথা আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ববঙ্গেরজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপে দেখতে চাই, সরকারি নওকারখানা রূপে নয়। এখানে আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি 'নূরনামা'র লেখক নোয়াখালির সন্দ্বীপনিবাসী আবদুল হাকিমের একটি কথা আমাদের দেশের এক শ্রেণির লোককে শুনিয়ে রাখছি—

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি।.
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়।।

যেমন আমরা বাংলার হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান এক মিশ্রিত জাতি, আমাদের ভাষা বাংলাও তেমনি এক মিশ্রিত ভাষা। বাংলার উৎপত্তি গৌড় অপভ্রংশ থেকে। সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পর্কটা অতি দূরের; তবুও যেমন কেউ বড় মানুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করেন আত্মগৌরবের জন্য, তা তিনি মেসোমশায়ের খুড়তুতো বোনের মামাশ্বশুরের পিসতুতো ভাই হোন না কেন, সেই রকমই আমরা বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের কুটুম্বিতা পাতাই। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত হল বটে। বিশেষ করে সংস্কৃতের ঋণ বাংলা ভাষার আপাদমস্তক এমন ভারাক্রান্ত করেছে যে, সম্পর্কটা স্বীকার না করেই অনেকে পারেন না।... বাংলার কোনো শব্দই সংস্কৃত থেকে আসেনি। তবে বাংলার গোড়ায় যে আর্য ভাষা, তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

সেই আর্য ভাষার সঙ্গে মিশেছে আদি যুগে ফারসি ও ফারসির ভিতর দিয়ে কিছু আরবি ও যৎসামান্য তুর্কি, এবং পরবর্তী যুগে পর্তুগিজ আর ইংরেজি। দুচারটা দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, ফরাসি, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষার শব্দও বাংলায় আছে। মিশ্র ভাষা বলে আমাদের কিছু লজ্জা নেই। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা চলিত ভাষা ইংরেজির প্রায় দশ আনা শব্দসমষ্টি বিদেশী। পশ্চিমবঙ্গের পরিভাষা-নির্মাণ-সমিতি খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় পরিভাষা রচনা করেছেন। পাঠ্যপুস্তকে এরূপ খাঁটি আর্যভাষা চলতে পারে; কিন্তু ভাষায় চলে না। বহুদিন পূর্বে রেলওয়ের স্থানে 'লৌহবর্ত্ম', টেলিগ্রাফের স্থানে 'তড়িতবার্তাবহ' প্রভৃতি প্রতিশব্দ সৃষ্টি করা হয়েছিল; কিন্তু সেগুলি পৌরাণিক বিশ্বমিত্রের সৃষ্টির মতোই অচল হয়ে গেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি, বা ছুঁতমার্গের কোনো স্থান নেই।

ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোঁড়ামি গোঁড়ামিকে জন্ম দেয়। এক দল যেমন বাংলাকে সংস্কৃতঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর এক দল বাংলাকে আরবি-ফারসিঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। এক দল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে, আর এক দল চাচ্ছে 'জবে' করতে। এক দিকে কামারের খাঁড়া, আর এক দিকে কসাইয়ের ছবি।

নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষারও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি (style) ও গতি কোনো নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না। ফরাসি ভাষায় বলে Le style c'est l'homme—ভাষার রীতি সেটা মানুষ—অর্থাৎ মানুষে মানুষে যেমন তফাত, প্রত্যেক লেখকের রচনাতেও তেমনি তফাত থাকা স্বাভাবিক। এই পার্থক্য নির্ভর করে লেখকের শিক্ষাদীক্ষা, বংশ এবং পরিবেষ্টনীর উপর। মোট কথা ভাষা হওয়া চাই সহজ, সরল, এবং ভাষার রীতি হওয়া চাই স্বতঃস্ফূর্ত, সুন্দর ও মধুর। এ সাধনার ধন। ঘষে মেজে রূপ আর ধরে বেঁধে পিরিত যেমন, নিয়মে বেঁধে ভাষার রীতি শেখানো তেমন। অবশ্য প্রয়োজনবোধে (খামখেয়ালিতে নয়) সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, জার্মান, রুশ যে কোনো ভাষা থেকে আমাদের শব্দ ধার করতে হবে। কিন্তু আমাদের দুটি কথা স্মরণ রাখা উচিত—ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য, ভাব গোপনের জন্য নয়; আর সাহিত্যের প্রাণ সৌন্দর্য, গোঁড়ামি নয়।

কিছু দিন থেকে বানান ও অক্ষর সমস্যা দেশে দেখা দিয়েছে। সংস্কারমুক্তভাবে এগুলির আলোচনা করা উচিত এবং তার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শ-সমিতি গঠন করা আবশ্যক। যাঁরা পালি, প্রাকৃত ধ্বনিতত্ত্বের সংবাদ রাখেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাংলা বানান অনেকটা অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং তার সংস্কার দরকার। স্বাধীন পূর্ববাংলায় কেউ আরবি হরফে, কেউবা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৬৫ জন যে নিরক্ষর তাদের অক্ষরজ্ঞান বিস্তারের জন্য কী চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ববাংলার বাইরে বাংলাদেশ না থাকত, আর যদি গোটা বাংলাদেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত, তবে অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙিন হত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। তার উপায় আরবি হরফ নয়; তার উপায় আরবি ভাষা। আরবি হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে। অধিকন্তু আরবিতে এতগুলি নূতন অক্ষর ও স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে যে, বাংলার বাইরে তা যে কেউ অনায়াসে পড়তে পারবে, তা বোধ হয় না। ফলে যেমন উর্দু ভাষা না জানলে কেউ উর্দু পড়তে পারে না, তেমনই হবে বাংলা।

বিদেশীর জন্য অক্ষরজ্ঞানের পূর্বে ভাষাজ্ঞান—এমন অদ্ভুত কল্পনা এ বৈজ্ঞানিক যুগে খাটে না। মীম-য়া-নুন এই বানান মেঁ, মাঁয়, ময়ন, মিয়ন, মুয়ুন, মীন, মেন, মূয়ন এই রকম বহু রূপেই পড়া যেতে পারে। যদি কোনো বৈজ্ঞানিক অক্ষর নিতে হয় তবে International Phonetic Script ব্যবহার করতে হয়। অক্ষর সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হলে ছাপাখানা, টাইপরাইটার, শর্টহ্যান্ড এবং টেলিগ্রাফের সুবিধা ও অসুবিধার কথা মনে করতে হবে। বিশেষ করে আজ যখন বাংলাকে প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে গহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণেরও সম্ভাবনা রয়েছে, তখন বাংলা ভাষার রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও উপযোগিতার কথা চিন্তা করারও প্রয়োজন রয়েছে। জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বেসিক ইংলিশ-এর মতো এক

সোজা বাংলা বিষয় বিবেচনা করা কর্তব্য। যদি ৮৫০টি ইংরেজি কথায় সমস্ত প্রয়োজনীয় ভাব প্রকাশ করতে পারা যায়, তবে বাংলায় তা কেন সম্ভব নয়? আমরা পূর্ববাংলার সরকারকে ধন্যবাদ দেই যে, তাঁরা বাংলাকে পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করে বাংলার দাবিকে আংশিকরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সরকারের ও জনসাধারণের বিপুল কর্তব্য সম্মুখে রয়েছে। পূর্ববাংলা জনসংখ্যায় গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি প্রভৃতি দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধনে-ধান্যে, জ্ঞানে-গুণে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোনো সভ্য দেশের সমকক্ষ করতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন নিতে ও দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যম স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করতে হবে।... ধর্মে যেমত আমরা একত্ববাদী, শিক্ষায়ও আমাদিগকে একত্ববাদী হতে হবে। এজন্য নানা বিষয়ে শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি পরামর্শসভার আশু প্রয়োজন হয়েছে। আজাদ পাকিস্তানে আমাদের অবিলম্বে শিক্ষা-তালিকার সংস্কার করতে হবে। এই নূতন তালিকায় উর্দুকে স্থান দিতে হবে। যারা এতদিন রাজভাষারূপে ইংরেজি চর্চা করেছে তাদের উর্দু শিখতে কি আপত্তি থাকতে পারে? দেশে গণশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা ও বয়স্কদের শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা, ধর্ম ও নীতি শিক্ষা এবং সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

আমাদিগকে একটি একাডেমী (পরিষদ) গড়তে হবে, যার কর্তব্য হবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলির অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ। এজন্য এক পরিভাষা-সমিতির প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আরবি, ফারসি এবং উর্দু ভাষা থেকে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বইগুলির অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। মুখে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বললেই পাকিস্তান জীবিত থাকবে না, তাকে ধর্মে ও জ্ঞানে, চরিত্রে ও দৈহিক শক্তিতে উন্নত করে, কৃষি ও শিল্প, বাণিজ্য ও রণকৌশলে, সাহিত্য ও কলায় মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত করতে হবে। যে দিন সে দিন হবে, সে দিন আমরা দ্বিধামুক্ত অযুত কণ্ঠে বলতে পারব—পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

—বদরুদ্দীন উমর

পূর্বপাকিস্তানি মধ্যবিত্তের মধ্যে যে সংস্কৃতি-চেতনার উন্মেষ হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ নতুন অথবা অপ্রত্যাশিত নয়। উপরন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রাকৃতিক জগতের মতো মানুষ এবং তার সমাজ কতকগুলো অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অনুবর্তী। কিন্তু এ চিন্তাধারা নতুন না হলেও তার মধ্যে এই হিসাবে অনেকখানি নতুনত্ব আছে যে, আজ এ চিন্তাধারার বিকাশ যাদের মধ্যে ঘটছে তারা এ জাতীয় চিন্তা করতে এতদিন অভ্যস্ত অথবা প্রস্তুত ছিল না।

এ কথার অর্থ কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, ধর্মগতভাবে মুসলমান পূর্বপাকিস্তানিরা, প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা, ভারতবর্ষ অথবা বাংলাদেশকে উচিতমতভাবে কখনো স্বদেশ মনে করেননি। শ্রেণি-স্বার্থের কারণে স্বদেশের সাথে আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপনে তাঁদের বরাবরই আপত্তি ছিল এবং এই আপত্তি ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির ফলে অধিকতর ঘোরতর আকার ধারণ করে।

নিজের দেশকে স্বদেশ মনে না করার জন্যে মানুষের জীবনে যে দুর্যোগ স্বাভাবিক, মুসলমানরা সে দুর্যোগকে রোধ করতে পারেননি। পাক-ভারত উপমহাদেশের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের যে কারণে এদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান নেই, অনেকখানি সেই কারণেই মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনও হয়েছে পঙ্গু ও সৃষ্টিহীন।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা এদেশের সাথে আত্মীয়তা বোধ করতে না পারার কারণ প্রধানত তিনটি। ধর্মগতভাবে তারা ছিল খ্রিষ্টান, তাদের ভাষা ছিল ইংরেজি এবং তাদের দেহে প্রবাহিত ছিল ইংরেজদের রক্ত। ইংরেজরা যেহেতু এ দেশের শাসনকর্তা ছিল এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা ছিল সেই শাসকদের ধর্মাবলম্বী, তাদের ভাষাভাষী এবং তাদের রক্তগত আত্মীয়, কাজেই তারা নিজেদেরকে মনে করত ভারতবর্ষের লোকদের থেকে উচ্চ শ্রেণির ও উচ্চবংশীয়। তাছাড়া ধর্মগত, ভাষাগত এবং রক্তগত ঐক্য এবং সম্পর্কের জন্যে তারা নিজেদেরকে ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের মতো বিদেশীশাসিত মনে না করে মনে করত এ দেশের শাসনকর্তা—রাজার জাতি। কাজেই ইংরেজি ছিল তাদের ভাষা, ইংলন্ডের ইতিহাস ছিল তাদের জাতীয় ইতিহাস এবং অ্যাংলিকান চার্চ ছিল তাদের জাতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠান।

বিদেশের সাথে এই কৃত্রিম আত্মীয়তা এবং স্বদেশের সাথে অনাত্মীয়তাবোধের ফলে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের অবস্থা সংস্কৃতি ও রাজনীতিগতভাবে এক শোচনীয় আকার ধারণ করে। এই শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয় ইংরেজদের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের অবস্থার সাথে এসব দিক দিয়ে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা অনেকাংশে তুলনীয়। সামন্তশ্রেণির মুসলমানেরা

মোগল রাজত্ব এমনকী ইংরেজ রাজত্ব পর্যন্ত, বাংলায় কথা না বলে ফারসি-উর্দুতে কথা বলতেন, নিজেদেরকে জাতিগতভাবে মনে করতেন আরব, ইরানি, তুর্কি, খুরসানি অথবা সমরকন্দি এবং তাঁদের ধর্ম ছিল ইসলাম। তাই বৈদেশিক ভাষা, রক্ত ও ধর্মের প্রভাব সামন্ততান্ত্রিক এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি-স্বার্থের তাগিদে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে এ দেশের মাটির সাথে মুসলমানদের আত্মিক যোগ-স্থাপনকে করল বাধাগ্রস্ত। দেশের মাটির সাথে এই সম্পর্কহীনতার ফলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চেতনার উপযুক্ত উন্মেষ সম্ভব হল না, তাদের সাংস্কৃতিক চেতনার উপযুক্ত উন্মেষ সম্ভব হল না, তাদের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাও বাধাগ্রস্ত হল বহুতরভাবে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ দেশকে বাতিল করে সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা আকাশ-কুসুম রচনার মতো অবাস্তব ও বন্ধ্যা হতে বাধ্য।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধর্মভেদ থাকলে তাদের সাংস্কৃতিক দৈন্য এতখানি উৎকট আকার ধারণ করত না। কিন্তু ধর্মভেদ অন্যান্য ভেদাভেদের ভিত্তিস্বরূপ কাজ করার ফলে অবস্থার অবনতি ঘটল এবং সে অবনতিকে রোধ করা গেল না। মুসলমান উচ্চশ্রেণির নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্যে মোগলযুগোত্তর বাংলাদেশে ধর্মের দোহাই দিয়ে এ দেশের সাথে, এ দেশের ভাষা সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে, সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাদের উৎসাহের অন্ত রইল না। এর ফলে বাংলাভাষায় ধর্মচর্চা করাও তাদের পক্ষে হল সম্ভব। এবং উনিশ শতকে ধর্মচর্চা ক্ষেত্র থেকে মুসলমানদের বাংলাভাষাকে বাদ দেওয়াই হয়ে দাঁড়াল তাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক দৈন্যের অন্যতম মূল কারণ। হিন্দুদের সাথে এদিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা বিশেষভাবে তুলনীয়। মুসলমানদের থেকে ধর্মচর্চার তাড়না উনিশ শতকে হিন্দুদের মধ্যে কম ছিল না। উপরন্তু এক হিসাবে বেশিই ছিল। সে সময় হিন্দু সমাজে বহু ধর্মান্দোলনের উৎপত্তি এবং প্রসার হয়েছিল। হিন্দুদের সংস্কৃতিচর্চা এই ধর্মান্দোলনের ফলে সমৃদ্ধ হল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা হল না। এর প্রধান কারণ মুসলমানদের চিন্তা বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত না হয়ে আবর্তিত হল আরব, ইরান, তুর্কির চতুর্দিকে—অনেকখানি যেমন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের চিন্তা আবর্তিত হচ্ছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে।

মাত্র কিছুসংখ্যক ব্যতীত বাংলার সমস্ত মুসলমানেরই পূর্বপুরুষরা এ দেশের অধিবাসী এবং হিন্দু। কাজেই ধর্মীয় কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশকে পুরোপুরি স্বদেশ মনে না করার কোনো কারণ তাদের ছিল না। কিন্তু উচ্চশ্রেণির মুসলমানেরা নিজেদের সুবিধামতো একজাতিত্ব আবিষ্কার করে ক্রমাগত প্রচার করলেন যে, সৎ বংশজাত মুসলমান মাত্রেরই পূর্বপুরুষ আরব, ইরান, তুর্কি থেকে আগত। এর ফলে মুসলমানরা নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নত হওয়া মাত্র সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বংশতালিকা রচনা করে সচেষ্ট হলেন নিজেদের বংশ-পরিচয় পরিবর্তনে। এ ভাবেই মুসলমানরা আত্মিক দিক থেকে স্বদেশে থাকলেন পরবাসী হয়ে।

মুসলমানদের এই মানসিকতার পরিবর্তনের শুরু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এবং এই পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ ভাষা আন্দোলনে। পূর্বে উর্দু না জানলে কোনো মুসলমানই সৎবংশজাত বলে পরিচিত হতেন না। শুধু তাই নয়, বাংলা তাঁর মাতৃভাষা

স্বীকার করলেও তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত। পূর্ববাংলার ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্ব প্রথম বাঙালি মুসলমান 'মুসলমান বাঙালি'তে রূপান্তরিত হতে শুরু করল এবং সমস্ত সংস্কার বর্জন করে, উর্দুকে নিজের ভাষা হিসাবে বাতিল করে, বাংলাকে স্বীকার করল মাতৃবাষা রূপে। এইভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানদের জীবনে সূত্রপাত হল এক অভূতপূর্ব চেতনার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দ্বারা মুসলমানদের মনে কোনো সত্যিকার বিপ্লব ঘটে থাকে তাহলে এই হল তার সঠিক পরিচয়।

মুসলমানদের যে দৃষ্টি দেশের প্রতি এতকাল ছিল মমতাহীন, সেই দৃষ্টিই আচ্ছন্ন হল স্বদেশের প্রতি প্রেম ও মমতায়। ১৯৪৭ সাল থেকে ভাষা ও সংস্কৃতির সংগ্রাম তাই আসলে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনেরই সংগ্রাম। যে মধ্যবিত্ত মুসলমান নিম্ন অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে দেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্বিগ্ন হত, এর পর থেকে তার সে উদ্বেগের অবসান হতে শুরু হল। বাঙালি পরিচয়ে সে আর লজ্জিত হল না। যে চিত্ত ছিল পরবাসী, সে চিত্ত সচেষ্ট হল স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে। প্রতিকূল শক্তি এবং সংস্কার এ পরিবর্তনকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও ঘরে ফেরার এ সংগ্রাম রইল অব্যাহত এবং তারা জয় করে চলল একের পর এক ভূমি। স্বীকৃত হল রাষ্ট্রভাষা বাংলা, বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য; স্বীকৃত হল রবীন্দ্রনাথ এবং পহেলা বৈশাখ। এ স্বীকৃতির কোনো কোনোটি এল সরকারি ঘোষণাপত্রে, কিন্তু তার সত্যিকার ক্ষেত্র হল পূর্বপাকিস্তানি মুসলমান মধ্যবিত্তের বিস্তীর্ণ মানসলোকে। এ দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়কে তাই নিশ্চিন্ত মনে বলা চলে মুসলমান বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

স্বরূপের সন্ধানে

—আনিসুজ্জামান

পূর্বপাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা যখন ঘটল, তখন তার কল্পিত রূপের অনেকখানি গেল বদলে। মুসলিম লিগ সমগ্র বাংলা প্রদেশকেই পাকিস্তানের অংশস্বরূপ দাবি করেছিলেন। কার্যত সে-প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হল। আর এর ফলে দেখা দিল নতুন কিছু প্রশ্ন। মুসলমান লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা যিনি অর্জন করেছিলেন, সেই নজরুল ইসলাম ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে পড়ে রইলেন কলকাতায়। ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব সত্ত্বেও কি তাঁকে পাকিস্তানিরা এখন নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশস্বরূপ বলে দাবি করতে পারবে? আর প্রশ্ন তো শুধু নজরুলকে নিয়েই নয়। অন্যেরাও আছেন। কাজী আবদুল ওদুদ্ (১৮৯৪–১৯৭০), কি এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০–১৯৫১), হুমায়ুন কবির (১৯০৬-৬৯) কি গোলাম কুদ্দুস স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন ভারতীয় নাগরিকত্ব। সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৫-৭৪) অচিরেই পাকিস্তান থেকে চলে গেলেন ভারতে। এমনকী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন বা আবুল মনসুর আহ্মদও পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নতুন রাষ্ট্রে চলে আসেননি; কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনে তাঁরা ব্যস্ত রইলেন। তাই একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়ে উঠল যে, কয়েক লক্ষ পাকিস্তানি অমুসলমানের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে যদি ধর্মীয় বিচারের মাপকাঠি প্রয়োগে করা যায়, তাহলেও সুরাহা হয় না। আবার যদি নতুন রাজনৈতিক সীমানার ভিত্তিতে ভাগাভাগি করতে হয়, তাহলেও ছেড়ে দিতে হয় অনেক লাভ, মেনে নিতে হয় অনেক দায়। নিদানস্বরূপ তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল ভাবাদর্শগত এক মাপকাঠি প্রয়োগের।

এই পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যেমন ছিল দুরূহ, মতৈক্য স্থাপন হওয়াও তেমনি ছিল দুঃসাধ্য। তাই বিচিত্র নয় যে, সেদিন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশ্নে পূর্বপাকিস্তানে একাধিক মতবাদ দেখা দিয়েছিল। একটি মতবাদ শুধু বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানকেই স্বীকার করেছিল, অমুসলমান লেখকদের কীর্তি হয় উপেক্ষণীয় নয়তো বর্জনীয় বলে বিবেচনা করেছিল। এই ভাবনার একটি কৌতূহলোদ্দীপক অভিব্যক্তি ঘটেছিল ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ্ সাহেবের কাছে প্রদত্ত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মুসলমান যুবকদের লইয়া গঠিত' রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের স্মারকলিপিতে। এই স্মারকলিপিতে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাভাষার দাবির পক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তার একটিতে বাংলাভাষার সমৃদ্ধিসাধনে 'আলাওয়াল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসীমউদ্দীন ও আরো অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যেকে'র অবদানের উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ মুসলমান বলে ভারতবাসী নজরুল ইসলাম ও ওয়াজেদ আলীর কথা স্মরণ করা গিয়েছিল অসংকোচে, কিন্তু অমুসলমান বলে লোকান্তরিত রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়নি। স্মারকলিপির অপর একটি যুক্তিতে বলা হয় যে, এই 'ভাষার শব্দসম্পদ মাধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ পারসিক ও আরবি ভাষা হইতে গৃহীত।' এই তথ্য

অতিরঞ্জনের ভাগ ছিল মাত্র পনেরো গুণ। তবে এ-থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে কর্মপরিষদ যে-রণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন, তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'মুসলিম'-চরিত্রের ওপরেই অতিরিক্ত গুরুত্বদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। আর তা হয়তো অকারণ ছিল না। কেননা বিরোধীপক্ষ ইতোমধ্যেই বাংলাভাষাকে 'রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, বেদ এবং অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত' বলে অভিহিত করতে শুরু করেছিলেন। তবে ব্যাপারটা সর্বত্র শুধু সাময়িক কৌশলের ছিল না। যাঁরা জাতীয় ঐতিহ্যের কথা ভাবছিলেন তাঁদের জন্যে তা হয়ে উঠেছিল এক সজ্ঞান প্রয়াসের বিষয়। সৈয়দ আলী আহ্সান (জ. ১৯২২) এই সজ্ঞান অভিপ্রায়ের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এভাবে :

প্রাক্তন সম্পূর্ণ বাংলার সাহিত্যের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষিত হবে না। সেগুলোর উপর উভয় বাংলারই পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু এই অধিকার থাকার অর্থ এই নয় যে, এই সাহিত্যের ট্রেডিশনও আমরা গ্রহণ করব। নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজব। সে সঙ্গে একথাও সত্য যে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশি। ...পূর্ব বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের উত্তরাধিকার হল ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্য, অগণিত অমার্জিত পুঁথিসাহিত্য, অজস্র গ্রামগাথা, বাউল ও অসংস্কৃত অঙ্গের পল্লীগান।

এই উপলব্ধি থেকে পরিচালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর সম্পাদিত দু-খণ্ড *'গল্প সংগ্রহে'* (ঢাকা, ১৯৫২) কোনো অমুসলমান লেখকের গল্প স্থান পায়নি। এ-ধরণের আরেকটি সংকলন হল পাকিস্তান পি. ই. এন প্রকাশিত *Poems from East Bengal* (করাচি, ১৯৫৪)। এতে চতুর্দশ থেকে বিংশ শতাব্দীর নির্বাচিত বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ স্থান পায়। সংকলনে নজরুলের এগারোটি এবং হুমায়ুন কবিরের একটি কবিতা স্থান পেয়েছিল। অমুসলমান কবিদের মধ্যে ছিলেন শুধু সমকালীন পূর্বপাকিস্তানের একজন অপ্রধান কবি : গ্রন্থভুক্ত তাঁর একমাত্র কবিতার বিষয়বস্তু ছিল ঈদ-উৎসব। কেন যে এ-ব্যতিক্রম সাধিত হয়েছিল, এই বিষয়বস্তু থেকে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। নির্বাচনের এই পদ্ধতির সঙ্গে অনুবাদিকা-সম্পাদিকার নিম্নোক্ত বক্তব্য মিলিয়ে নেওয়া চলে :

Rural Bengal, comprising of weavers, artisans and peasants, is mainly Muslim...They delve into the store-house of Muslim legends and Islamic history, besides native customs and rites for their matter and material...

Often the charge is made against the heathen character of Eat Pakistan Literature... But is is perhaps the most unjustified to charges... images drawn from a romantic pagan past became nevertheless the stock-in-trade of Urdu poetry. Precisely in the same manner the East Pakistan poet used terms such as "Rudra", "Tandav", "Binapani", "Mahakal"—which are pregnanted with associations abstract or personified—effortlessly.

তবে যাঁরা এ-ধরণের শব্দকে পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যিক ভাষা থেকে নির্বাসিত করার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরা উপরিউক্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারতেন না।

বাংলাভাষার বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতার অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান (জ. ১৯০৬)। বাংলাভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে এক পরিত্যক্ত ধারণাকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁর মতে, বাংলাভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা বলে প্রমাণ করার যে চেষ্টা করেছেন হিন্দু পণ্ডিতেরা, তা অগ্রাহ্য। আসলে বাংলাভাষা আর্য-আগমনের পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত দাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা—সংস্কৃত বা আর্য ঐতিহ্যের সঙ্গে এ-ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই। এই তত্ত্বের সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক ছিলেন কবি গোলাম মোস্তাফা। যদিও বাংলাভাষার সকল পণ্ডিত এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তবু ষাটের দশকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য বাংলা সাহিত্য-সংকলনের ভূমিকায় গোলাম মোস্তফা এই মত প্রচারের সুযোগলাভ করেছিলেন।

তবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংক্রান্ত বিতর্কে গোলাম মোস্তফার একটি নিজস্ব অবদান ছিল। ইসলামি ভাবাদর্শের মাপকাঠিতে অতীত বা সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্মের গ্রহণযোগ্যতা বিচারের একটি তত্ত্ব তিনি উপস্থিত করেন ১৯৫০ সালে। বিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার ভাব ও আদর্শের এবং প্রকৃতি জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইসলামের 'চমৎকার সৌসাদৃশ্য' লক্ষ করে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন কবির। এখন নজরুল ইসলামের কবিতায় এসব গুণের অভাবের জন্যে নজরুলকে যতোচিত আক্রমণ করলেন তিনি। কাব্যবিচারের এ বিশেষ পদ্ধতিকে পাকিস্তানি আদর্শ বলে অভিহিত করে গোলাম মোস্তফা প্রস্তাব করলেন যে, হিন্দু ভাবধারার সঙ্গে সম্পর্কিত হবার দায়ে নজরুলের কাব্যের অধিকাংশ—তাঁর ভাষায়, যা অবাঞ্ছিত অংশ—বর্জিত হোক। নজরুলের বিরুদ্ধে আবার তিনি এই আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন ১৯৫৮ সালে। তার দু-বছর আগে মাইকেল মধুসূদনকে তিনি পাকিস্তানের মহাকবি বলে অভিহিত করেন। তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করে গোলাম মোস্তফা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন : মধুসূদনের জন্মভূমি পূর্বপাকিস্তানের সীমানার ভেতরে পড়েছিল (গোলাম মোস্তাফার নিজের জন্মভূমির অদূরে); মধুসূদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বরণ করেছিলেন খ্রিষ্টধর্ম; আর রামায়ণের পাষণ্ড চরিত্ররাবণকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন মহাকাব্যের নায়করূপে। অনেকটা গোলাম মোস্তফার মতো ইসলামি ভাবাদর্শের প্রতি আনুগত্য থেকে আবদুর রহমান খাঁ (১৮৮৯-১৯৬৪) পূর্বপাকিস্তানের নাট্যকারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন নারী-ভূমিকা-বর্জিত নাটক রচনার জন্যে।

সাংস্কৃতিক অতীত সম্পর্কে দু-ধরণের বক্তব্যের পরিচয় আমরা পেলাম। একটিতে ছিল ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজনের আয়োজন, অপরটিতে ছিল ভাবাদর্শগত পরীক্ষার প্রস্তাব। তৃতীয়টিকে বলা যেতে পারে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি : মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে বিশেষ গর্ববোধ সত্ত্বেও বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের সমগ্রতা সম্পর্কে সচেতনতা এতে প্রকাশ পেয়েছিল। এই মতের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ দেখা যায়

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিলে প্রদত্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহারের (১৯০৬-৬৪) বক্তৃতায়। তিনি খুব সহজভাবে দেখতে পেয়েছিলেন যে 'হিন্দু-মুসলিম হাত ধরাধরি করে সৃষ্টি করেছে বাংলা সাহিত্য।' তাই তাঁর বক্তৃতায় কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অসংকোচ উল্লেখ ছিল। তাঁর মতে :

বাঙ্গালার বিরাট জনসমাজ এখনো সাহিত্যে স্থান পায়নি। আজ পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকের কাজ হবে রিক্ত সর্বহারাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া। এদের হাসিকান্না, সুখদুঃখ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা। এক কথায় সত্যিকারের গণ-সাহিত্য সৃষ্টির সাধনা হবে আমাদের সাধনা।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ভাষনে হবীবুল্লাহ্ বাহার আরেকবার সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পটভূমিকায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এই সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) যেসব মতামত প্রকাশ করেন, তার মধ্যে কয়েকটি ছিল এ-রকম :

১. 'স্বাধীন পূর্ববাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্বশাখায় সমৃদ্ধ এক সাহিত্য। এই সাহিত্যে আমরা আজাদ পাক-নাগরিক গঠনের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুশীলন চাই। এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়।'
২. 'আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না।'
৩. 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি সত্য।

এই বক্তব্যের জন্যে সেদিন ডক্টর শহীদুল্লাহ্কে অনেক বিরূপতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচিব, সিভিল সার্ভিসের উর্দুভাষী সদস্য, জনাব ফজলে আহমদ করিম ফজলি সম্মেলনের সভামঞ্চেই শহীদুল্লাহ্র তীব্র সমালোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অধিকাংশ শ্রোতার তিরস্কারধ্বনির মধ্যে তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু পরদিনই প্রায় একই ধরণের ভাষায় শহীদুল্লাহ্কে আক্রমণ করে দৈনিক *'আজাদ'* পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। *'আজাদে'র* সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল বলে মনে না; বরঞ্চ সাপ্তাহিক *'সৈনিক'* পত্রিকাও শহীদুদল্লাহ্-বিরোধিতায় 'আজাদে'র সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে এই তিন ধরণের মতামতই পাশাপাশি অভিব্যক্ত হতে থেকেছিল। গোলাম মোস্তফা প্রবর্তিত ভাবাদর্শগত তত্ত্বের সংকীর্ণতা এতই স্বপ্রকাশ ছিল যে তা নিয়ে তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি। তবে স্কুলপাঠ্য-পুস্তকাদি প্রণয়নে তাঁর মতামত অনেকখানি গৃহীত হয়েছিল বলে মনে হয়। সেই পরিচয় বিধৃত হয়েছিল যেমন রচনাদির নির্বাচনে, তেমনি মূল পাঠের পরিবর্তন-সাধনে (যেমন, নজরুলের কবিতাংশে 'ভগবানে'র

বদলে 'রহমান' পাঠ সন্নিবেশ)। পরে বেতার কর্তৃপক্ষও এই ধরণের একটা নীতি অনুসরণ করেছিলেন : তবে পাঠ-পরিবর্তনের চেয়ে প্রচারযোগ্য রচনা নির্বাচনের ক্ষেত্রেই সে নীতির প্রকাশ ঘটেছিল অধিক।

সম্প্রদায়গত পরিচয়ের তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। মূখ্যত এই তত্ত্বের প্রভাবে—হয়তো অংশত ভাবাদর্শগত তত্ত্বের অনুপ্রেরণায়—উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যতালিকায় অমুসলমান লেখকদের বইপত্রের বদলে মুসলমান লেখকদের রচনাদি সন্নিবেশ করার একটা দাবি উঠেছিল। সে দাবি মেনেও নেওয়া হয়েছিল অনেকখানি; তবে পন্ডিতেরা একটা পর্যায়ের পর আর পরিবর্তন করতে সম্মত হননি—আরো পরিবর্তন করলে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিপর্যস্ত হবে, এই যুক্তিতে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে এই তত্ত্বের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কয়েকটি সংকলনগ্রন্থে তার উদাহরণ মেলে। যেমন, আহ্‌মদ শরীফ-সম্পাদিত 'মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ' (ঢাকা, ১৩৬৯) এবং একাডেমীর নিজস্ব সংকলন 'আধুনিক কাব্য-সংগ্রহ' (ঢাকা, ১৩৭০) ও 'আধুনিক গদ্য-সংগ্রহ' (ঢাকা, ১৩৭১)। এসব ছিল শুধু মুসলমান কবি ও গদ্যলেখকদের রচনার সংগ্রহ। তেমন সংকলন প্রণয়নে কারো আপত্তি থাকতে পারে না; কিন্তু এসব গ্রন্থের নামকরণ থেকে সংকলনের সেই প্রকৃতি বোঝার কোনো উপায় নেই। একই তত্ত্বের অনুপ্রেরণায় নজরুল ইসলামকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলে প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন চলেছিল। এই বিচারে নজরুল যেমন হয়ে উঠেছিলেন কবি ইকবালের বাংলাভাষী সম্পূরক, তেমনি পরিণত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কার্যকর প্রতিপক্ষে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আরো পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৫৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সংস্কৃতি সম্মেলন এবং ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে। শেষোক্ত সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলভী আবদুর রহমান তাঁর ভাষণে স্পষ্টতই ঘোষণা করেন : 'এখন আমি আর বাঙালি নই। আমি পূর্বপাকিস্তানি।'

তবে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের পরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমগ্রতা সম্পর্কে নতুন করে আস্থাজ্ঞাপনের ভাব প্রকাশ পেতে থাকে। অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশে ভাষা-আন্দোলনের অবদান ছিল সুদূরপ্রসারী। এর পর থেকে তাই ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অতীতের বিচার করা সহজতর হয়েছিল। অন্য মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-৭১) প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, সোহ্‌রাব-রুস্তমের কাহিনির মতো প্রাক-ইসলামি ফারসি উপাখ্যান যদি মুসলমানের পক্ষে নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে যুধিষ্ঠির-অর্জুনের কাহিনির মতো প্রাক-ইসলামি ভারতীয় উপাখ্যান গ্রহণযোগ্য হবে না কেন? কুমিল্লায় ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত পূর্বপাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ঢাকায় ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন এবং কাগমারিতে ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে গতি দিয়েছিল। সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিরুদ্ধ পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছিলেন এই ভাষায় :

১৯৪৮ সালে ডিসেম্বরে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম, স্বাধীনতার নতুন নেশায় আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবি হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবি পারসি শব্দের অবাধ আমদানি, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা, এমনকী বাঙালি নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন। কেউ এতে মিলিত বঙ্গের ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে দিলেন এবং বেজায় হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন।

যে ভূতের ভয়ের উল্লেখ তিনি করেছিলেন, তা আবার বড় করে দেখা ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর সময়ে। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টাকে সরকার যতদূর সম্ভব বাধা দিয়েছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় শুধু রবীন্দ্রনাথকে নয়, বাংলার সমগ্র সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকেই নিজেদের বলে দাবি করার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বাংলাভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়; সেখানে সভাগৃহের ভেতরে ও বাইরে অজস্র শ্রোতা দুর্বোধ্য চর্যাগীতি থেকে শুরু করে দুরূহ আধুনিক কবিতার আবৃত্তি শুনেছিলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। এই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে যাঁদের কবিতা, গদ্যরচনা ও গান আবৃত্ত, পঠিত ও গীত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলেই ছিলেন। ছিলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গীয় হলেও যাঁর মৃত্যু ঘটেছিল ভারতীয় হিসেবে। তাঁর কবিতায় পূর্ববাংলার যে-বিশিষ্ট প্রকৃতি ধরা পড়েছিল, তার জন্যে তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে এ-জনপ্রিয়তা অনেকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঢেউ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে।

এই আবহাওয়ায় পাকিস্তান আন্দোলনের সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিক আবুল মনসুর আহমদ ১৯৬২ সালে লেখেন :

পূর্ব ও পশ্চিম বাঙালিদের ভাষা এক হরফ এক। আমাদের উভয়ের সাহিত্যিক ঐতিহ্য এক। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম ও সত্যেন দত্ত উভয় বাংলার গৌরবের ও প্রেরণার বস্তু।

আর, পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক স্বকীয়তা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

এ-স্বকীয়তার পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলেই সমভাবে শামিল ও শরিক। তাদের সকলের সম্মিলিত রূপ প্রতিফলিত হইবে এই স্বকীয়তায়।

আবদুল মনসুর আহমদ যদিও তাঁর পুরোনো মতামতের অনেকখানি বজায় রেখেছিলেন, তবু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৪ সালের বক্তব্য থেকে যে তিনি কতদূর সরে এসেছিলেন, ওপরের উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়।

তবে আবুল মনসুর আহমদ নতুন কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধি ছিলেন না। সে-স্বর শোনা গিয়েছিল আবদুল হকের (জ. ১৯২০) কণ্ঠে :

পূর্বপাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এ-প্রদেশের যাত্রা, কবিগান, লোকগাথা, লোকগীতি, হস্তশিল্প, নৃত্যকলা, নাট্যমঞ্চ, সাহিত্য এবং এমনি আরো অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এসেছে, এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের প্রায় একাধিপত্য রয়েছে, যেমন যাত্রায় সাঁওতালি নৃত্যে, মনিপুরি নৃত্যে। এ-সব ক্ষেত্রে পূর্বপাকিস্তানের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অবদান যেমন অস্বীকার করা সম্ভব নয় এবং ভবিষ্যতেও যে তাদের এইসব সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ চলবে না এবং তারা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। পূর্বপাকিস্তানের এই সংখ্যালঘু সংস্কৃতিকে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে পারি না এবং এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর ওপরও আমরা জোর করে ইসলামি সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে পারি না।

...এই মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে সংখ্যালঘু সংস্কৃতির যোগ করে যে সামগ্রিক সংস্কৃতি, তাই পূর্বপাকিস্তানের সংস্কৃতি এবং তা পাকিস্তানেরও সংস্কৃতি।... পাকিস্তানি সংস্কৃতিতে 'অনৈসলামিক' বস্তুর পরিমাণ কম নয়, সংখ্যালঘু সংস্কৃতি এর মধ্যে ধরা হোক না না হোক। এই 'অনৈসলামিক' সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে যদি আমরা বিশুদ্ধ ইসলামি সংস্কৃতিকেই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি বলি, তবে আমাদের সংস্কৃতির অনেক কিছু, এমনকী হয়তো অধিকাংশই, বাদ দিতে হবে এবং সে দাবি হবে যেমন অযৌক্তিক, তেমন অবাস্তব।...

আমাদের যে-সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তা হবে জাতিভিত্তিক, তার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধান হতে পারে, অপ্রধানও হতে পারে। সে সংস্কৃতি আমাদের সামাজিক এবং জাতীয় জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করলেই খুশি হব, সেটাই হবে তার বিচারের মানদণ্ড।...

আর বদরুদ্দীন উমর (জ. ১৯৩১) উপস্থাপন করবেন নৈয়ায়িক যুক্তি ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ :

'আমরা বাঙালি না মুসলমান?' এ প্রশ্ন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মনকে কিছুদিন থেকে আলোড়িত করে এলেও আজ সেটা আবার অল্পসংখ্যক পূর্বপাকিস্তানবাসীর মনে নতুন করে দেখা দিয়েছে।

...কেউ যদি প্রশ্ন করেন, 'আমরা কি বাঙালি, না মৎস্যভোজী, না সংগীতামোদী, না বিশ্বশান্তিকামী?' তাহলে প্রশ্নকারীকে অনেকেই অস্বচ্ছ চিন্তা করার দায়ে অভিযুক্ত করবেন।... 'আমরা বাঙালি, না মুসলমান, না পাকিস্তানি?' এই প্রশ্নের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা বলা যেতে পারে।...

কিন্তু বাঙালি বলতে কাদেরকে বোঝায়? এর উত্তর খুবই সহজ। বাংলাদেশের যে কোনো অংশে যারা মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করে, বাংলা ভাষায় কথা বলে, বাংলাদেশের আর্থিক জীবনে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে তারাই বাঙালি।... কিন্তু একথাও আবার অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশের মুসলমানেরা অনেকক্ষেত্রে নিজেদেরকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে

দ্বিধা এবং সংকোচ বোদ করেন। এই দ্বিধা এবং সংকোচের উৎপত্তি সাম্প্রদায়িকতায়। সাম্প্রদায়িকতার জন্যই বাংলার সাধারণ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে মুসলমানেরা নিজেদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত হন না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে একথা সত্য ছিল এবং এখনও পূর্ববাংলার অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের মনে এ-সংশয় এবং প্রশ্ন রীতিমতো জাগ্রত। তাঁদের ধারণা আমরা বাঙালি বলে নিজেদের পরিচয় দিলে হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয় ইসলামবিরোধিতা করে বসব।এ-ধারণা যে কত ভ্রান্ত সেটা অন্যান্য দেশ এবং জাতির ইতিহাসের কথা স্মরণ করলে সহজেই বোঝা যাবে।

আরো পরে মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১) খুব সহজভাবে লিখেছিলেন :

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সহস্র বৎসর পুরাতন। এই ভাষায় রচিত সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আমার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মুনীর চৌধুরীর এই ঘোষণা প্রকাশ পেয়েছিল দেশব্যাপী এক বিতর্কের পটভূমিকায়। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী জাতীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে জানান যে, 'পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী' বলে বেতার থেকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জন করা হবে। এই তথ্য সংবাদপত্রে মুদ্রিত হলে ঢাকার উনিশজন লেখক-শিল্পী-সাহিত্যানুরাগী এক বিবৃতিতে সরকারি সিদ্ধান্তকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' আখ্যা দিয়ে বলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্যদান করেছে, তাঁর সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে, তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে।' সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটি বিবৃতি প্রচারিত হয় এবং তার স্বাক্ষরকারীরা পাকিস্তানি সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রথমোক্ত বিবৃতিতে অভিব্যক্ত ধারণার প্রবল প্রতিবাদ করেন। আরো কয়েকটি বিবৃতি ও পালটা বিবৃতি প্রকাশিত হবার পর সরকারি ইঙ্গিতে সংবাদপত্রে এ বাদানুবাদ প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে এই বিষয় নিয়ে পূর্ববাংলার সর্বত্র একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। জুলাই মাসে ঢাকায় এক সাংস্কৃতিক কর্মী-সম্মেলনে 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ' নামে এক সংগঠনের পত্তন করা হয়। পরের মাসে প্রথমবারের মতো পূর্ববাংলায় বিশেষ সমারোহে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

চল্লিশের দশকের গোড়ায় 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার' কথাটা প্রথম শোনা গিয়েছিল। ষাটের দশকের শেষে তার অর্থ গেল একেবারে পালটে। সত্তরের দশকের শুরুতে রবীন্দ্রনাথেরই একটি গান বাঙালি জাতীয়তাবাদের বাহনে পরিণত হল। অল্পকাল পর সেই গানটিই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়।

চল্লিশের দশকে যখন 'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণে'র দাবি প্রথম উত্থাপিত হয়, তখন সেই সঙ্গে ঘোষিত হয় বাংলা বানান পদ্ধতি ও বর্ণমালার আশু সংস্কারসাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা। বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলা দূর করার উদ্দেশ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়মাবলি প্রণয়ন করেন, তার সর্বশেষ সংস্করণ (১৯৩৬) প্রচারিত হয় এর অল্পকাল

আগে। কিন্তু 'আত্মনিয়ন্ত্রণ'বাদীরা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। কারণ তাঁদের লক্ষ্য ছিল বাংলা বর্ণের সংখ্যা 'হ্রাস' করে তারপর বানান 'সরল' করে ফেলা। মনে হয়, তারা যাকে 'সংস্কৃতের প্রভাব' বলে নির্ণয় করেছিলেন, তার থেকে মুক্তিলাভের অভিপ্রায় থেকেই তাঁরা এই সংস্কার-প্রস্তাব করেছিলেন।

সংস্কারের প্রস্তাব আরো অনেকে করেছিলেন তবে তাঁরা পরিচালিত হয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলি সংশোধন করতে চেয়েছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (এবং যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি) সাক্ষরতা বৃদ্ধির আশায় এক ধরনের লিপিসংস্কারের প্রস্তাব করেছিলেন আবুল হাসনাত (জ. ১৯০৫)। ভিন্ন লিপিতে বাংলাভাষা লেখার প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়েছিল। 'আল এসলামে'র একজন প্রবন্ধকার ১৯১৫ সালে আরবি হরফ বাংলা লেখার সুপারিশ করেছিলেন। তিরিশের দশকে বাংলা লিপির পরিবর্তে রোমান বর্ণমালা গ্রহণের প্রস্তাবে সোৎসাহে সায় দিয়েছিলেন 'সওগাত' ও 'বুলবু'ল' পত্রিকা।

আরবি হরফের সমর্থনে প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, যেহেতু কুরআন শরিফ মুসলমান মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য, সুতরাং আরবি হরফে তাকে শিখতেই হবে; আর আরবি হরফে যদি বাংলাভাষা লিখিত হয়, তবে একবারের বর্ণপরিচয়েই তার পক্ষে দুটি ভাষা পাঠযোগ্য হবে। আরবি-ফারসি হরফে বাংলা শেখার কিছু বিচ্ছিন্ন প্রয়াস ঘটেছিল আঠারো শতকে—প্রধানত চট্টগ্রাম অঞ্চলে। বিংশ শতাব্দীতে এই ধারার উত্তরসাধক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন মৌলানা জুলফিকার আলী : চট্টগ্রাম থেকে 'হুরুফুল কুরআন' নামে আরবি হরফে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করতেন।

কিন্তু অন্য হরফে বাংলা লেখার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা শুধু আরবি-ফারসির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে আগেই ওড়িয়া, কায়থি, দেবনাগরী, মৈথিলি ও সিলেটি নাগরীতেও বাংলা লেখার প্রয়াস হয়েছিল। সিলেটি নাগরী তো বেশ জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া, মিশনারিদের লেখা বাংলা গদ্যের বই লিসবন থেকে রোমান হরফে ছাপা হয়েছিল অঠারো শতকে। কিন্তু বাংলা লিপি নিজস্ব ধারা কখনো ক্ষুণ্ন হয়নি।

বিশ ও তিরিশের দশকে ভারতবর্ষের সকল ভাষার জন্যে একটি গ্রহণ করা যায় কিনা, এ নিয়ে ভাবনা দেখা দেয়। অনেকে প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব লিপি রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন; অনেকে সর্বভারতীয় লিপিরূপে রোমান ও দেবনাগরীর কথা বলেছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (জ. ১৮৯০) ছিলেন রোমান বর্ণমালার সমর্থক, বিকল্পে দেবনাগরী ব্যবহারের পক্ষপাতী (শেষোক্ত ধারণা অবশ্য পরে তিনি পরিহার করেছিলেন)। এই বিতর্কের কালেই 'সওগাত' ও 'বুলবুল' রোমান হরফের সমর্থন করেন। এ-সমর্থন যে শুধু দেবনাগরীর বিরোধিতা করার জন্যে ছিল না, তা বোঝা যায় 'বুলবুলে'র মন্তব্য থেকে।

শুধু ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের (জ. ১৯০৬) কণ্ঠে ভিন্ন সুর ধ্বনিত হয়েছিল। 'গায়ের জোরে কোনো সংস্কার' সাধনের বিপত্তি সম্পর্কে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ১৯৪৪ সালে।

পাকিস্তান আন্দোলনের কালে এই আন্দোলনের সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিকেরা বাংলা বর্ণমালার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ কামনা করেননি। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে সরকারি উদ্যোগ সেই পথ নিল। তার প্রথম আভাস পাওয়া যায় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রদত্ত হবীবুল্লাহ্ বাহারের বক্তৃতায়। বাংলা লিপি-সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি সম্ভাব্য তিনটি উপায়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন : বাংলা বর্ণমালার সংস্কারসাধন, আরবি হরফে প্রবর্তন অথবা রোমান লিপি গ্রহণ। এই ১৯৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় ফেরদাউস খানের (জ. ১৯১২) পুস্তিকা *A Comparative Study of Three Scripts* : এতে বাংলাভাষার ধ্বনিপ্রকাশের জন্যে রোমান বা আরবি লিপির তুলনায় বাংলা বর্ণমালার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সরাসরি আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের কিছু সমর্থকও তিনি পেলেন সঙ্গে সঙ্গে : যুক্তি হিসেবে তাঁরা সকলেই দিয়েছিলেন ধর্মের দোহাই। কিছুকাল পরে আরবি হরফের পক্ষে ইংরেজি ভাষায় গোলাম মোস্তফা যে পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, তার থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই :

Not only Bengali literature, even the Bengali Alphabet is full of idolatry. Each Bengali letter is associated with this or that god or goddess of Hindu patheon....

In my opinion Pakistan and Devanagari script cannot coexist. It looks like defending the frontier of Pakistan with Bharati soldiers!

...To ensure a bright and great future for the Bengali language it must be linked up with the Holy Quran which is a great power-house of energy and inspiration. Hence the necessity and importance of Arabic script.

...Islam is the best of all religions, the Quran is the best of all revealed Books; similarly the Arabic language and the script must be the best language and best script of the world.

আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। সরকারি প্রশ্নমালার জবাবে এবং পৃথকভাবে প্রবন্ধ লিখে তিনি বলেন যে, আরবি হরফ প্রবর্তনের ফলে জ্ঞানের স্রোত রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর বৈজ্ঞানিক বিচারে বাংলাভাষার জন্যে তা হবে অনেক পেছনে চলে যাওয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের পক্ষ থেকে সরকারি উদ্যোগের প্রতিবাদ করা হয়। এমনকী, প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পূর্ববঙ্গ ভাষা সংস্কার কমিটিও এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ভাষা সংস্কার কমিটির রিপোর্ট ১৯৫০ সালে সরকারের কাছে পেশ করা হলেও ১৯৫৮ সালের আগে তা প্রকাশিত হয়নি। তবে এই সময়ের মধ্যে বাংলায় আরবি হরফ প্রচলনের জন্যে সরকার অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

আরবি ও রোমান হরফ প্রত্যাখ্যান করলেও ভাষা সংস্কার কমিটি বাংলা বর্ণমালা ও বানানপদ্ধতি সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তবে তাঁদের রিপোর্ট যতদিনে প্রকাশিত হয়, ততদিনে সামরিক সরকার দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদের

ইচ্ছে হল, বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষার জন্যে রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করা। এবারে দোহাই দেওয়া হল জাতীয় ঐক্যের। এই মতের কিছু সমর্থকও দেখা দিলেন, তবে দুই ভাষার অধিকাংশ পণ্ডিত ও লেখক একযোগে সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। বিষয়টি নিয়ে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজও বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করে। কিছুকাল পরে সেই প্রয়াস পরিত্যক্ত হয়। সামরিক সরকারের আরেকটি সংকল্প ছিল, বাংলা ও উর্দু মিশিয়ে দেশের জন্যে একটা সাধারণ ভাষার বিকাশ ঘটানো। রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রয়াস ব্যর্থ হলে সে প্রচেষ্টাও স্থগিত রাখা হয়।

তবে পণ্ডিতদের অনেকেই বাংলা লিপি-সংস্কারের প্রস্তাব কখনো না কখনো উত্থাপন করতে থাকলেন—সরকারের কাছে নয়, গবেষণামূলক পত্রিকায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করে। এ-সম্পর্কে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ফেরদাউস খানের প্রবন্ধ এবং ১৯৬২-৬৩তে প্রকাশিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-৬৯) ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর রচনা উল্লেখযোগ্য। বাংলা একাডেমী কর্তৃক গঠিত একটি উপসংঘ বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের সুপারিশ করেন ১৯৬৩ সালে। এই সুপারিশ কার্যকর করার কোনো চেষ্টা হয়নি এবং এই নিয়ে কোনো বিরোধও দেখা দেয়নি। শুধু রফিকুল ইসলাম (জ. ১৯৩৪) একটি প্রবন্ধ লিখে উপসংঘের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন।

১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা আকস্মিকভাবেই বাংলা বর্ণমালা, বানান পদ্ধতি ও ব্যাকরণের সংস্কার ও সরলীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এবারে দেওয়া হল বৈজ্ঞানিকতার দোহাই। কিন্তু হরফের প্রসঙ্গটি ততদিনে একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট যখন ১৯৬৮ সালে দাখিল করা হল, তখন দেখা গেল যে, কমিটির তিনজন বিশিষ্ট সদস্য—মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী—লিপি ও বানান-সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। যাঁরা কোনো না কোনো সময়ে লিপি-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে—মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী ছাড়াও—অনেকেই এখন প্রকাশ্যে সংস্কার-প্রস্তাবের বিপক্ষে মত দিলেন। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো আন্দোলন দেখা দিল। সেই আবেগমুখর সময়ে শামসুর রাহমান (জ. ১৯২৯), হাসান হাফিজুর রহমান (জ. ১৯৩২) এবং আরো কোনো কোনো কবি বাংলা বর্ণমালার প্রতি মমত্ব প্রকাশ করে যেসব কবিতা রচনা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। অল্পকাল পরে শিল্পী কামরুল হাসান উদ্ভাবিত বর্ণতরু শোভা পেতে লাগল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিংবা জনপথের সংযোগস্থলে। ১৯৬৯-এর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে নতুন অভিজ্ঞান সংযুক্ত হল নাগরিকদের পোশাকে। তাতে বড় করে ছাপা একটি বাংলা বর্ণ, আর তার উপরে-নীচে লেখা : 'একটি বাংলা অক্ষর—একটি বাঙালির জীবন'।